দম্পতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

পুনর্মুদ্রণ
শ্রাবণ, ১৩৬৬

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস, সি, মজুমদার কর্ত্তৃক

উপহার

দম্পতি

চুয়াডাঙ্গা যাইবার বড় রাস্তার দু'পাশে দুইখানি গ্রাম—দক্ষিণ-পাড়া ও উত্তর-পাড়া। দক্ষিণ-পাড়ায় মাত্র সাত-আট ঘর ব্রাহ্মণের বাস আর বনিয়াদী কায়স্থ বসু-পরিবার এ-গ্রামের জমিদার। উত্তর-পাড়ার বাসিন্দারা বিভিন্ন জাতির। ইঁহাদের জমি-দারও কায়স্থ। উপাধি—বসু। উভয় ঘরই পরস্পরের জ্ঞাতি। বসুগণ গ্রামের মধ্যে বৰ্দ্ধিষ্ণু, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব নাই। রেষারেষি ও মনোমালিন্য লাগিয়াই আছে।

দম্পতি

দক্ষিণ-পাড়ার নীচে 'কুসুম বামনীর দ' নামে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন জলাশয়ের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া উভয়-ঘরের মধ্যে আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসু একদিন সকালে লোকজন লইয়া সেখানে মাছ ধরিতে গিয়া দেখিলেন, ছোট-তরফের গদাধর বসু অপর পাড়ে তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়া, জেলে নামাইয়া মাছ ধরিতেছেন। সত্যনারায়ণ বসু কৈফিয়ৎ চাহিলেন—তিনি-বর্ত্তমানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গদাধরের এমন আচরণের হেতু কি? গদাধর তদুত্তরে যাহা বলিলেন, সত্যনারায়ণ বসুর পক্ষে তাহা সম্মানজনক নয়। কথার মধ্যে একটা শ্লেষ ছিল, সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে কলিকাতায় লেখাপড়া করিতে যাইয়া বকিয়া গিয়াছিল—তাহার সখের দেনা মিটাইতে সত্যনারায়ণকে সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয়-কোবালা করিয়া, চুয়াডাঙ্গায় কুণ্ডুদের গদি হইতে প্রায় হাজার-দুই টাকা সংগ্রহ করিতে হয়।

বসু-বংশের এই সৌখীন ছেলেটির কথা ঘুরাইয়া গদাধর এমনভাবে বলিলেন, যাহাতে সত্যনারায়ণের মনে বড় বাজিল। দুজনের মধ্যে সেই হইতে মনোমালিন্যের সূত্রপাত—তারপর উভয়-তরফে ছোট-বড় মামলা-মোকদ্দমা, এমন কি, ছোটখাটো দাঙ্গা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখাদেখি অনেকদিন হইতে বন্ধ।

গদাধর বসুর বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, তবে বসু-বংশের দৈহিক ধারা অনুযায়ী বেশ দীর্ঘাকৃতি। ম্যালেরিয়ায় বছরের মধ্যে ছ'মাস ভুগিলেও গদাধরের

শরীরে খাটিবার শক্তি যথেষ্ট। উভয়-তরফের মধ্যে তাঁহারই অবস্থা ভালো। আশপাশের গ্রাম হইতে সুবিধা দরে পাট কিনিয়া, মারোয়াড়ী মহাজনদের নিকট বেচিয়া হাতে বেশ দু'পয়সা করিয়াছেন। এই গ্রামেরই বাহিরের মাঠে তাঁহার টিনের চালাওয়ালা প্রকাণ্ড আড়ত। গ্রামের বাহিরে মাঠে আড়ত করিবার হেতু এই যে, আড়তটি যে-স্থানে, সেটি দুটি বড় রাস্তার সংযোগস্থল। একটি চুয়াডাঙ্গা যাইবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তা, অপরটি লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা, সেটি বাণপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগরগামী পাটের গাড়ী এখান দিয়াই যায়—পথের মধ্যে গাড়ী ধরিয়া পাট নামাইয়া লইবেন—এই উদ্দেশ্যেই এই উভয়-রাস্তার সংযোগস্থলে আড়ত-ঘর তৈরী।

গদাধর বসু বৎসরে বিস্তর পয়সা রোজগার করেন—অর্থাৎ কলিকাতার হিসাবে বিস্তর না হইলেও, পাড়াগাঁয় হিসাবে দেখিতে গেলে, বৎসরে পাঁচ-ছ' হাজার টাকা নিট্ মুনাফা সিন্দুকজাত করার সৌভাগ্য যাহার ঘটে—প্রতিবেশি-মহলে সে ঈর্ষার ও সম্ভ্রমের পাত্র।

গদাধরের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ী বট-অশ্বত্থ গাছ গজাইয়া, খিলান ফাটিয়া, কার্নিশ ভাঙিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেকালের অনেক জানালা-দরজায় চাঁচের বেড়া বাঁধিয়া আবরু রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত। তবু সেই বাড়ীতেই গদাধর পুত্র-পরিবার লইয়া চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছেন। টাকা হাতে

দক্ষিণ-পাড়ার নীচে 'কুসুম বামনীর দ' নামে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন জলাশয়ের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া উভয়-ঘরের মধ্যে আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসু একদিন সকালে লোকজন লইয়া সেখানে মাছ ধরিতে গিয়া দেখিলেন, ছোট-তরফের গদাধর বসু অপর পাড়ে তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়া, জেলে নামাইয়া মাছ ধরিতেছেন। সত্যনারায়ণ বসু কৈফিয়ৎ চাহিলেন—তিনি-বর্ত্তমানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গদাধরের এমন আচরণের হেতু কি ? গদাধর তদুত্তরে যাহা বলিলেন, সত্যনারায়ণ বসুর পক্ষে তাহা সম্মানজনক নয়। কথার মধ্যে একটা শ্লেষ ছিল, সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে কলিকাতায় লেখাপড়া করিতে যাইয়া বকিয়া গিয়াছিল—তাহার সখের দেনা মিটাইতে সত্যনারায়ণকে সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয়-কোবালা করিয়া, চূয়াডাঙ্গায় কুণ্ডুদের গদি হইতে প্রায় হাজার-দুই টাকা সংগ্রহ করিতে হয়।

বসু-বংশের এই সৌখীন ছেলেটির কথা ঘুরাইয়া গদাধর এমনভাবে বলিলেন, যাহাতে সত্যনারায়ণের মনে বড় বাজিল। দুজনের মধ্যে সেই হইতে মনোমালিন্যের সূত্রপাত—তারপর উভয়-তরফে ছোট-বড় মামলা-মোকদ্দমা, এমন কি, ছোটখাটো দাঙ্গা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখাদেখি অনেকদিন হইতে বন্ধ।

গদাধর বসুর বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, তবে বসু-বংশের দৈহিক ধারা অনুযায়ী বেশ দীর্ঘাকৃতি। ম্যালেরিয়ায় বছরের মধ্যে ছ'মাস ভুগিলেও গদাধরের

শরীরে খাটিবার শক্তি যথেষ্ট। উভয়-তরফের মধ্যে তাঁহারই অবস্থা ভালো। আশপাশের গ্রাম হইতে সুবিধা দরে পাট কিনিয়া, মারোয়াড়ী মহাজনদের নিকট বেচিয়া হাতে বেশ দু'পয়সা করিয়াছেন। এই গ্রামেরই বাহিরের মাঠে তাঁহার টিনের চালাওয়ালা প্রকাণ্ড আড়ত। গ্রামের বাহিরে মাঠে আড়ত করিবার হেতু এই যে, আড়তটি যে-স্থানে, সেটি দুটি বড় রাস্তার সংযোগস্থল। একটি চুয়াডাঙ্গা যাইবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তা, অপরটি লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা, সেটি বাণপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগরগামী পাটের গাড়ী এখান দিয়াই যায়—পথের মধ্যে গাড়ী ধরিয়া পাট নামাইয়া লইবেন—এই উদ্দেশ্যেই এই উভয়-রাস্তার সংযোগস্থলে আড়ত-ঘর তৈরী।

গদাধর বসু বৎসরে বিস্তর পয়সা রোজগার করেন—অর্থাৎ কলিকাতার হিসাবে বিস্তর না হইলেও, পাড়াগাঁয় হিসাবে দেখিতে গেলে, বৎসরে পাঁচ-ছ' হাজার টাকা নিট্ মুনাফা সিন্দুকজাত করার সৌভাগ্য যাহার ঘটে—প্রতিবেশি-মহলে সে ঈর্ষার ও সম্ভ্রমের পাত্র।

গদাধরের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ী বট-অশ্বত্থ গাছ গজাইয়া, খিলান ফাটিয়া, কার্নিশ ভাঙিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেকালের অনেক জানালা-দরজায় চাঁচের বেড়া বাঁধিয়া আবরু রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত। তবু সেই বাড়ীতেই গদাধর পুত্র-পরিবার লইয়া চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছেন। টাকা হাতে

থাকা সত্ত্বেও গদাধর বাড়ী মেরামত করেন না কেন, বা নিজের পছন্দমত নতুন ছোট-বাড়ী আলাদা করিয়া তৈরি করেন না কেন ইত্যাদি প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক; বিশেষতঃ যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে জিনিসটা দেখিবেন। ইহার কারণ আর যাহাই হউক, গদাধরের কৃপণতা যে নয়—ইহা নিশ্চিত। কারণ, গদাধর আদৌ কৃপণ নহেন। প্রতি বৎসর তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গোৎসব ও কালীপূজা করিয়া গ্রামের শূদ্র-ভদ্র তাবৎ লোককে ভোজন করাইয়া থাকেন—গরীবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করেন, সম্প্রতি 'কুসুম বাম্‌নীর দ'র উত্তরপাড়ে একটি বাঁধানো স্নানের ঘাট করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে মিত্রপক্ষের মতে প্রায় তিনশত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে—তবে শত্রুপক্ষ বলে, মেজ-তরফ নির্ব্বংশ হইয়া যাওয়ায় উভয়-ঘরেরই সুবিধা হইয়াছে—ভিটের পুরাতন ইটগুলি সত্যনারায়ণ ও গদাধরে মিলিয়া দশহাত বাড়াইয়া লুঠ চালাইতেছে। বিনামূল্যে সংগৃহীত পুরাতন ইটের গাঁথুনি বাঁধাঘাটে আর কত খরচ পড়িবে?...ইত্যাদি।

যাক্, এসব বাজে কথা।

আসল কথা, গদাধর গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিশালী ও সাহসী লোক। একবার গদাধরের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। গদাধর হাঁকডাক করিয়া লোকজন জড় করিয়া, নিজে রামদা হাতে লইয়া হৈ-হৈ শব্দে গ্রাম মাতাইয়া ছুটিয়াছিল, কিন্তু ডাকাতদের টিকিও দেখা যায় নাই।

একদিন গদাধর আড়তে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন, কাছে

পুরাতন মুহুরী ভড় মহাশয় বসিয়া কাগজপত্র লিখিতেছেন। আজ গদাধরের মনটা খুব প্রসন্ন, কারণ, এইমাত্র কলিকাতার মহাজন বেলেঘাটার আড়ত হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্বের পাটের চালানে মণ-পিছু মোটা লাভ দাঁড়াইবে।

গদাধর মুহুরীকে বলিলেন—ভড়মশায়, চালানটা মিলিয়ে দেখলেন একবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাড়ে-সাত আনা খরিদ-দরের উপর টাকায় দু'পয়সা আড়তদারি, আর গাড়ীভাড়া দু'আনা এই ধরুন আট আনা—দশআনা···

—ওরা বিক্রি করেচে কততে?

—সাড়ে-চোদ্দ—ওদের আড়তদারি বাদ দিন টাকায়এক আনা···

—ওইটে বেশি হচ্চে ভড়মশায়। সিঙ্গিমশায়দের একটা চিঠি লিখে দিন, আড়তদারিটার সম্বন্ধে···

—বাবু, ও-নিয়ে আরবারে কত লেখালেখি হলো জানেন তো? ওরা ওর কমে রাজী হবে না—আমরাও অন্য-কোনো আড়তে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারবো না। সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে বাবু ও-আড়তদারি আমাদের না দিয়ে উপায় নেই। ওদের চটালে কাজ চলবে না। পূজোর সময় দেখলেন তো?

—বাদ দিন ও-কথা। কত মণের চালান?

—সাড়ে-পাঁচশো আর খুচরো সাতাশি···

বাহির হইতে আড়তের কয়াল নিধু সা আসিয়া বলিল—মুহুরী-মশায়, কাঁটা ধরাবো? মাল নামচে গাড়ী থেকে।

ভড় মহাশয় বলিলেন—ক'গাড়ী?

—দু'গাড়ী এলো-পাট—কালকের খরিদ।

—ভিজে আছে?

—তা তো ছাখলাম না—আসুন না একবার বাইরে।

গদাধর ধমক দিয়া কহিলেন—মুহুরীমশায়ের না গেলে, ভিজে কি শুক্‌নো পাট দেখে নেওয়া যায় না? দেখে নাওগে না—কচি খোকা সাজচো যে দিন-দিন।

নিধু সা কাঁচা কয়াল নয়, কয়ালী কাজে আজ ত্রিশ বছর নিযুক্ত থাকিয়া মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিল। কাঁটায় মাল উঠাইবার আগে মালের অবস্থা যাচাই করাইয়া লওয়ার কাজটা আড়তের কোনো বড় কর্ম্মচারীর দ্বারা না করাইলে ভবিষ্যতে ইহা লইয়া অনেক কথা উঠিতে পারে—এমন কি, একবার দেখাইয়া লইলে, পরে বিক্রেতার সহিত যোগসাজসে মণ-মণ ভিজা পাট কাঁটায় তুলিলেও আর কোনো দায়িত্ব থাকে না—তাহাও সে জানে। বাবুরা ইহার পর আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। তবুও সে গদাধরের কথার প্রতি সমীহ করিয়া বিনীত-ভাবে বলিল—তা যা বলেন বাবু, তবে মুহুরীবাবু পাট চেনেন ভালো, তাই বলছিলাম।

গদাধর বলিলেন—মুহুরীমশায় পাট চেনে, আর তুমি চেনো না? আর এতে পাট-চেনাচেনির কি কথাই-বা হলো? হাত দিয়ে দেখলে বোঝা যায় না, পাট ভিজে কি শুক্‌নো?

নিধু কয়াল দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

মুহুরীর দিকে চাহিয়া গদাধর বলিলেন—ভড়মশাই, নিধেটা দিন-দিন বড় বেয়াদব হয়ে উঠচে—মুখোমুখি তর্ক করে।

ভড় মহাশয় তার উত্তরে মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ইহার কারণ, গদাধরের চণ্ডালের মত রাগে ইন্ধন যোগাইলে, এখনি চটিয়া লাল হইয়া নিধু কয়ালকে বরখাস্তও করিতে পারেন তিনি। কিন্তু ভড় মহাশয় জানেন, নিধু সা চোর বটে, তবে সত্যই কয়ালী-কাজে ঝুনা লোক—গেলে অমনটি হঠাৎ জুটানো কঠিন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল।

এইসময় কে একজন বাইরে কাহাকে বলিতেছে শোনা গেল—না, এখন দেখা হবে না, যাও এখন।

গদাধর হাঁকিয়া বলিলেন—কে রে ?

নিধু কয়ালের গলায় উত্তর শোনা গেল—কে একজন সন্নিসি ফকির, বাবু।

কথার শেষ ভালো করিয়া হইতে-না-হইতে একজন পাঞ্জাবী-সাধু ঘরে ঢুকিল—হলুদে পাগড়ী-পরা, হাতে বই—সে-ধরণের সাধুর মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচয় সকলেরই আছে আমাদের। ইহারা সাধারণতঃ রামেশ্বর তীর্থে যাইবার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বাংলাদেশে আসিয়া গৃহস্থের ঘরে-ঘরে হাত দেখিয়া বেড়ায় ও প্রবাল, পাকা-হরীতকী, দুর্ল্লভ ধরণের শালগ্রাম ইত্যাদি প্রত্যেক ভক্তকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া, পাথেয় ও খোরাকী বাবদ পাঁচ টাকার কম লয় না।

গদাধর বলিলেন—কি বাবাজি ? কাঁহাসে আসৃতা হ্যায় ?

সাধু হাসিয়া বলিল—কলকত্তা—কালিমায়ীকি থান সে। হাত দেখলাও।

—বোসো বাবাজি।

গদাধর হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন। সাধু বলিল—অঙ্গুঠি উতার লেও—

মুহুরী বলিলেন—আংটি খুলে নিতে বলছে হাত থেকে।

গদাধর তখনি সোনার আংটিটি খুলিয়া হাতের আঙুল প্রসারিত করিয়া সাধুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সাধু বলিল—চাঁদি ইয়ানে সোনা হাত মে রাখ্‌সো? হাত্‌মে চাঁদি রাক্‌খো! নেই তো হাত কেইসে দেখেগা?

এ-কথা শুনিয়া বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া হাতে রাখিয়া গদাধর সাধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সাধু হাতখানা ভালো করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—তেরা বহুৎ বুরা দিন আতা—ইন্‌সাল ইয়ানে দুসর্‌ সাল-সে বহুৎ-কুছ্‌ গড়বড় হো যায়গা!

গদাধর ভালো হিন্দী না বুঝিলেও মোটামুটি জিনিসটা বুঝিলেন। কিন্তু তিনি আবার একটু নাস্তিক-ধরণের লোক ছিলেন, কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখা যাক্‌।

সাধু বলিল—কেয়া?

—কিছু না···বল্‌তা হ্যায়, বেশ।

সাধু বলিল—কুছ্‌ যাগ করনে হোগা। পরমাত্মাকা কৃপা-সে আচ্ছা হো যায়গা—করোগে?

—ওসব এখন হোগাটোগা নেই বাবাজি, আবি যাও।

—তেরা খুশি!

বলিয়াই খপ্ করিয়া হাতের টাকাটি তুলিয়া লইয়া বেমালুম ঝুলির মধ্যে পুরিয়া সাধু বলিল—আচ্ছা, রাম-রাম বাবু।

গদাধর একটু অবাক হইয়া বলিলেন—টাকাটা নিলে যে?

—দচ্ছিনা তো চাহিয়ে বেটা। নেহি দচ্ছিনা দেনে-সে কোই কাম্ আচ্ছা নেহি বন্‌তা!

সাধু আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গদাধর বেকুবের মত বসিয়া রহিলেন।

ভড় মহাশয় বলিলেন—টাকাটা দিব্যি কেমন নিয়ে গেল!

গদাধর রাগত স্বরে বলিলেন—সব জোচ্চোর! সাধু না হাতী! একটা টাকার ঘাড়ে জল দিয়ে গেল বিকেলবেলা! আরও বলে কি না, তোমার খারাপ হবে।

দু-একজন বলিল—তাই বললে নাকি বাবু?

—শুনলে না, কি বললে? তাই তো বললে!

তারপর ও-প্রসঙ্গ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় গদাধর মুহুরীর দিকে চাহিয়া জোরগলায় বলিলেন—তারপর ভড়মশায়, বেলেঘাটার গদিতে একখানা চিঠি মুসাবিদে ক'রে ফেলুন চট্ ক'রে!

—কি লিখবো?

—ওই আড়তদারির কথাটা নিয়ে প্রথমে লিখুন—হারাধন সিঙ্গি-কেই চিঠিখানা লিখুন যে, নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং, আপনাদের এত নম্বর চালান যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে—আপনারা এতবার লেখালেখি সত্ত্বেও টাকায় এক আনা করিয়া আড়তদারি বজায় রাখিয়াছেন দেখিয়া—

এইসময় গদাধরের পত্তনী মৌজা সুন্দরপুরের একটি প্রজা ঝুড়িতে কয়েকটি ছোট-বড় কপি আনিয়া গদির আসনে নামাইতে, চিঠি-লেখানো বন্ধ করিয়া গদাধর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কিরে রতিকান্ত? ভালো আছিস্? এতে কি?

—আজ্ঞে, কয়েকখান কপি আপনার জন্যি এনেলাম—এবার দশ কাঠা জমিতে কপি হয়েচে, তা বিষ্টির অবানে সে বাড়তি পারলো না বাবু। তারওপর নেগেচে কাঁচকুমুরে পোকা—পাতা কেটে-কেটে ফ্যালায় রোজ সকালে-বিকালে এত-এত—

রতিকান্ত হাত দিয়া কীট দ্বারা কর্ত্তিত পাতার পরিমাণ দেখাইল।

গদাধর বলিলেন—না, তা ফুল মন্দ হয়নি তো বাপু, বেশ ফুল বেধেচে। যা বাড়ীতে দিয়ে এসে একটু গুড়-জল খেয়ে আয় গে বাড়ী থেকে।

ভড় মহাশয় বলিলেন—তারপর আর কি লিখবো বাবু?

—আজ থাক ভড়মশায়। সন্দে হয়ে এলো। আমার একটু কাজ আছে মুখুয্যে-বাড়ী। রতিকান্ত, আয় আমার সঙ্গে—ভড়মশায়, কপি একটা রাখুন।

—না না বাবু, আপনার বাড়ীতে থাক্—আমি আবার কেন—

—তাতে কি? আমরা কত খাবো? রতিকান্ত, দাও একখানা ভালো দেখে ফুল নামিয়ে। নিয়ে যান না!

রতিকান্তকে লইয়া চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে গদাধর বলিলেন—ক্যাশটা তাহ'লে আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে ক'রে? না, আমি নিয়ে যাবো?

—তাহ'লে বাবু আর-একটু বসতে হয়। ক্যাশ বন্ধ করি এবার, মিলিয়ে দিই।

—বসি।

—বাবু, ওবেলা ও আট আনা হাওলাত কার নামে লিখবো?

—ও যা হয় করুন, ঢুলি-খরচ ব'লে লিখুন না? ঢোল সহরৎ তো করতেই হবে—আজ না হয় কাল!

—আর, এবেলার এই এক টাকা?

—কোন্ এক টাকা?

—এই যে সাধু নিয়ে গেল!

—ও! ওটা আমার নামে খরচ লিখুন। ব্যাটা আচ্ছা ধাপ্পাবাজি ক'রে টাকাটা নিয়ে গেল!

—ওইজন্যেই আংটি খুলতে বলেছিল বাবু, এইবার বোঝা যাচ্ছে।

—সেই তো। কারণ, সোনা তো আংটিতে রয়েচে, আবার চাঁদি কি হবে যদি বলি? আংটি তো আর আঙুল থেকে টেনে খুলে নিয়ে সটকান্ দেওয়া যায় না! ডাকাত একেবারে! ওদের কথা সব মিথ্যে!

কথাগুলা গদাধর যেরূপ জোর দিয়া বলিলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি তাঁহার বোকামির জন্য নিজে যেমন লজ্জিত হইয়াছেন, সাধু সম্বন্ধে ভড় মহাশয়ের নিকট হইতেও সেইরূপ কটূক্তি শুনিতে পাইলে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হন। ভড় মহাশয় কিন্তু দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তিমান বৃদ্ধ ব্যক্তি। মনিবের মন যোগাইবার জন্যও তিনি সাধুর প্রতি অবিশ্বাসসূচক কোন কথা বলিতে রাজী নন্। সুতরাং তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে গদাধর বাড়ী ফিরিলেন।

স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী রান্নাঘরে ছিল, স্বামীর সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—আজ সকাল-সকাল যে? কি ভাগ্যি!

—কাজ মিটে গেল তাই এলাম। একটু চা খাওয়াবে?

—ভাতটা চড়েছে—নামিয়ে ক'রে দিচ্ছি।

—তুমি রাঁধচো নাকি?

—হ্যাঁ। আজ তো পিসিমার সন্দের পর থেকেই ভীষণ জ্বর এসেচে। তিনি উঠতেই পারেন না, তা রাঁধবেন কি?

—তাইতো। কাল একবার ডাক্তার ডাকি—প্রায়ই তো ওঁর জ্বর হোতে লাগলো···

—উনি ডাক্তারি-ওষুধ তো খাবেন না—ডাক্তার ডাকিয়ে কি করবে?

—তুমিই বা ক'দিন এরকম রাঁধবে?

—তা ব'লে কি হবে? যে ক'দিন পারি। বাড়ীর লোক কি না খেয়ে থাকবে?

গদাধর আর কোনো কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন —কিছুক্ষণ পরে চাকর তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। এই চাকরটির ইতিহাস বেশ নতুন ধরণের। ইহার নাম—গৈবি। বাড়ী—নেপাল। গদাধরের বাবার আমলে একদিন সে এ-গ্রামে আসিয়া ইঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে আজ সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। সেই থেকেই গৈবি এইখানে থাকে এবং কথাবার্ত্তায় সে পুরা বাঙালী। তাহাকে বর্ত্তমানে নেপালী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই।

গদাধর বলিলেন—গৈবি, কাল একবার শরৎ ডাক্তারের ওখানে যেতে হবে। পিসিমার জ্বর হয়েচে! বড্ড ভুগচেন, এবার নিয়ে বার-পাঁচেক জ্বরে পড়লেন।

গৈবি বলিল—পিসিমা কারো কথা শুনবে না বাবু! আমি বলি, তুমি পুকুরে ছেন কোরবে না, করলেই তোমায় জ্বরে ধরবে। তা, কারো কথা শুনবার লোক নয়। এখন যে জ্বরটি হলো, এখন কে ভুগবে? হ্যা!

—ঠিক। তুই কাল সকালেই যাবি ডাক্তারের কাছে।

—সকালে কেনো, এখুন বল্লে এখুনই যেতে পারি—হ্যাঁ!

—না, থাক্, এখন যেতে হবে না। তুই যা।

—বাবু, ভালো কথা—এক সাধুবাবাজি আপনার আড়তে গিয়েছিলো?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলো। কেন বল্‌তো?

—ও তো এখানে আগে এলো। বলে, বাবু কোথায়? বাবুর সাথে ভেট্ করবো। আমি ব'লে দিলাম, বাবু আড়তে আছে—সত্য গিয়েছিলো ঠিক তাহোলে?

—তা আর যাবে না? একটা টাকার ঘাড়ে জল দিয়ে গেল!

—এক টাকা? কি হলো বাবু?

—হবে আবার কি? ফাঁকি দিয়ে জোর ক'রে নিয়ে গেলে যা হয়!

এই সময় অনঙ্গ চায়ের বাটি হাতে করিয়া ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল—কে গা? কে দিলে ফাঁকি?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ঠকবার মজা কি জানো? যে ঠকে সে তো ঠকেই—আবার উপরন্তু পাঁচজনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে প্রাণ যায়!

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—বেশ, তাহ'লে দিও না কৈফিয়ৎ। কে চায় শুনতে?

—না, না, শোনো।

—শুনি তো আমার বড় দিব্যি!

—না যদি শোনাই, তবে আমারও অতি-বড় দিব্যি।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বলো, কি হলো শুনি?

গদাধর সাধুর ব্যাপার বলিলেন। অনঙ্গ শুনিয়া কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল, পরে কি ভাবিয়া বলিল—তুমি যদি সাধুকে বাড়ীতে আনতে তো বেশ হতো।

—কেন?

—আমার হাতটা দেখাতাম।

—তোমার হাত কি দেখবে আবার? দিব্যি তো আছো।

—দেখালে দোষ কি?

—ওরা কি জানে? আমার বিশ্বাস হয় না।

—তুমি নাস্তিক ব'লে সবাই তো নাস্তিক নয়!

—কি দেখাবে? আয়ু?

—তাও দেখাতাম বৈকি। দেখাতাম, তোমার আগে মরি কি না—

—এ সখ কেন?

—এ-সখ কেন, যদি মেয়েমানুষ হতে, তবে বুঝতে।

—যখন তা হইনি তখন আপসোস ক'রে লাভ নেই। এখন চা-টা খাবে? জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেল!

বলিয়া গদাধর চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিলেন।

স্বামীর কথায় চা-টুকু শেষ করিয়া অনঙ্গ ঘরের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই গদাধর বলিলেন—একটু দাঁড়াও না ছাই।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বসলে চলে? রান্না-বান্না সবই বাকী।

—তা হোক, বোসো একটু।

অনঙ্গ স্বামীর সংস্পর্শ হইতে বেশ-কিছু দূরে বসিয়া বলিল—এই বসলাম।

অর্থাৎ সে এখন শুচি-বস্ত্র পরিয়া রান্না করিতেছে—নাস্তিক গদাধরের আড়ত-বেড়ানো কাপড় পরনে, সে এখন স্বামীর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করিতে রাজী নয়।

গদাধর মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ছুঁয়ে দিই?

—তাহ'লে থাকলো হাঁড়ি উনুনে চড়ানো—সে হাঁড়ি আর নামবে না।

—ভালোই তো। কারো খাওয়া হবে না।

—কারো খাওয়ার জন্যে আমার দায় পড়েচে ভাববার। ছেলে-মেয়েরা কষ্ট পাবে না খেয়ে সেটাই ভাবনার কথা।

—ও, বেশ।

—আমার কাছে পষ্ট কথা—পষ্ট কথায় কষ্ট নেই।

—সে তো বটেই।

অনঙ্গ হাসিতে লাগিল। তাহার বয়স এই সাতাশ-আটাশ—প্রথম যৌবনের রূপ-লাবণ্য কবে ঝরিয়া গেলেও অনঙ্গ এখনও রূপসী। এখনও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। রং যে খুব ফর্শা তা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম বলিলেই ভালো হয়, কিন্তু অনঙ্গর মুখের গড়নের মধ্যে এমন একটা আল্‌গা চটক আছে, চোখ এমন টানা-টানা, ভুরু দুটি এমন সরু ও কালো, ঠোঁট এমন পাত্‌লা, বাহু দুটির গড়ন এমন নিটোল, মাথার চুলের রাশ এমন ঘন ও ঠাস্ বুনানো, হাসি এমন মিষ্ট যে, মনে হয়, সাজিয়া-গুজিয়া মুখে স্নো-পাউডার মাখিয়া বেড়াইলে এখনও অনঙ্গ অনেকের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিতে পারে!

নারীর আদিম শক্তি ইহার মধ্যে যেন এখনও নির্ব্বাপিত আগ্নেয়-গিরির গর্ভের সুপ্ত-অগ্নির মতই বিরাজমান।

গদাধর বলিলেন—সাধু আজ আমার হাত দেখে কি বলেচে জানো?

—কি গা?

—আমার নাকি শীগগির খুব খারাপ সময় হবে।

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা, সে কি গো!

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—তাই তো বললে!

—আচ্ছা, তোমার সব-তাতে হাসি আমার ভালো লাগে না! তুমি যেমন কিছু জানো না, বোঝো না—সবাই তো তোমার মত নয়! কি-কি বললে সাধুবাবা শুনি?

—ওই তো বললাম।

—সত্যি, এই কথা বলেচে?

—হ্যাঁ, ভড়মশায় জানে, জিজ্ঞেস্ কোরো।

—ওমা, শুনে যে হাত-পা আসচে না!

—হ্যাঃ—তুমি রেখে দাও। ভণ্ড সাধু সব কোথাকার, ওদের আবার কথার ঠিক!

অনঙ্গ ঝাঁজের সহিত বলিল—ওই তো তোমার দোষ। কাকে কি চটিয়েচো, কি ব'লে গিয়েচে। ওরা সব করতে পারে, তা জানো? ওদের নামে অমন তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করতে আছে? ওই দোষেই তোমায় ভুগতে হবে, দেখচি! সাধুকে কিছু দাওনি?

গদাধর হাসিয়া উঠিয়া হাতে চাঁদি-বসানো এবং সাধুর টাকা তুলিয়া লওয়ার বর্ণনা করিলেন।

অনঙ্গ বলিল—হেসো না। যাক্, তবুও কিছু দক্ষিণা-প্রণামী পেয়ে গিয়েচেন তো তিনি! আমার এখানে আগে এসেছিলেন—তখন যদি জানতাম, আমি ভালো ক'রে সেবা ভোগ দিতাম—মনটা খুশী ক'রে দিতাম বাবার···ওঁরা সব পারেন।

বলিয়া অনঙ্গ হাত জোড় করিয়া কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল।

গদাধরের দোষ এই, স্ত্রীর কাছে গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারেন না। অনঙ্গর কাণ্ড দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখা গদাধরের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা হাসি চাপিতে গিয়া শেষকালে ফল ভালো হইল না—ঘরের মধ্যে মনে হইল যেন একটা হাসির বোমা বুঝি-বা ফাটিয়া পড়িল!

অনঙ্গ রাগে ফরফর করিতে-করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

গদাধরের তখন আর-এক পেয়ালা হইলে মন্দ হইত না—কিন্তু স্ত্রীকে চটাইয়াছেন, সে-আশা বর্ত্তমানে নির্ম্মূল।

তিনি ডাকিলেন—গৈবি···

গৈবী বাহির-বাড়ী হইতে উত্তর দিল—যাই বাবু।

—ওরে, শোন এদিকে, একটু তামাক দে—আর একবার দেখে আয়, কলকাতা থেকে নির্ম্মলবাবু এসেচে কিনা··· মুখুয্যেবাড়ীর।

—এখনি যাবো, বাবু ?

—তামাক দিয়ে তারপর গিয়ে দেখে আয়। যদি আসে তো ডেকে নিয়ে আসবি।

এইসময় অনঙ্গ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কেন, নির্ম্মলবাবুকে ডাকচো কেন, শুনি ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—দরকার আছে। নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেবো না আমি।

—আমি কি ছেলেমানুষ ?

—ছেলে-বুড়োর কথা নয়। সে এসে কেবল টাকা ধার করে আর দেয় না! গাঁয়ের সকলের কাছেই নিয়েছে, এমন কি, মিনির বাপের কাজ থেকেও সাতটা টাকা নিয়ে গিয়েচে। তোমার কাছ থেকে তো অনেক টাকাই নিয়েছে। কিছু দিয়েচে ?

—দিক না-দিক, তোমার সে-সব খোঁজে দরকার কি ? তুমি মেয়েমানুষ—বাইরের সব কথায় থেকো না, বলচি।

নির্ম্মলের ব্যাপার লইয়া সেদিন ভড়মশায় আড়তেও গদাধরকে দু'একটা কথা বলিয়াছিল।

গদাধর জেদী লোক—যাহাকে লইয়া ঘরে-বাইরে তাঁর উৎপীড়ন, তাহাকে তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না—করিবেনও না। আসলে নির্ম্মল মুখুয্যে এ-গ্রামের ৺হরি গাঙ্গুলির জামাই। শ্বশুর-কুল নির্ম্মূল হওয়াতে বর্ত্তমানে শ্বশুরের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ-দখল করিতেছে। লোকটি সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত, এ-কথাও ঠিক—কারণ, আয়ের অনুপাতে তাহার ব্যয় বেশি।

নির্ম্মল মুখুয্যে আসিয়া বাহির হইতে হাঁকিল—গদাধর, আছো না কি হে! আসবো?

গদাধর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অনঙ্গ বলিল—উত্তর দাও তো দেখিয়ে দেবো মজা!

গদাধর হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—তোমার সব-তাতেই ভয়! জবাব দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে না তো!

দৃঢ় চাপা-কণ্ঠে অনঙ্গ বলিল—না।

—ভদ্রলোকের ছেলে বাড়ীতে এসেছে···

—আসুক।

ইঁহাদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল মুখুয্যে একেবারে ঘরের দোরের কাছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

—কি গো বৌ-ঠাকরুণ, আমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে যে—রাগ করলে না কি গরীবদের ওপর?

অনঙ্গ নির্ম্মলের কথার ভাবে হাসিয়া বলিল—কেন, রাগ করবো কেন?

—কাজ দেখেই লোক লোকের বিচার করে—তোমার কাজ দেখেই বলচি।

—না, রাগ করিনি।

—শুনে মনটা জুড়ুলো।

—থাক্, আর ঠাট্টায় কাজ নেই!

—এটা ঠাট্টা হলো বৌ-ঠাকরুণ? যাক্, এখন কি খাওয়াবে খাওয়াও তো সন্দেবেলা···

—সন্দেবেলা মানে, রাত্তিরে!

—রাত একে বলে না। এর নাম সন্দে।

—কি আর খাওয়াবো? ঘরে কি-বা আছে! আচ্ছা বসুন, দেখি।

গদাধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন! দু'জনের মধ্যে একটা মিটমাট হইতে দেখিয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি মনে ক'রে, এখন বলো? তোমার সঙ্গে অনেককাল দেখা নেই।

—ব্যস্ত ছিলাম ভাই, আমাদের খেটে খেতে হয়।

—আমাদেরও উঠোনে পয়সা ছড়ানো থাকে না—খুঁজে নিতে হয়।

—আমাদের যে খুঁজলেও মেলে না, সেই হয়েচে মুস্কিল!

—সন্দেবেলাটা বড় কাজ প'ড়ে গিয়েচে আজকাল, নইলে তোমার ওদিকে যেতাম।

—আমারও তাই। নইলে আগে তো প্রায়ই আসতাম।

—গ্যাখো ভাই নির্ম্মল, একটা কথা তোমায় বলি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে তোমার তো লোক আছে—আমায় কিছু কাজ পাইয়ে দাও না?

—নিজের কাজ ফেলে আবার পরের কাজ করতে যাবে কেন? তাছাড়া ওতে বড় ঝঞ্কাট।

—ঝঞ্কাট সহ্য করতে আর কি—টাকা রোজগার নিয়ে বিষয়। ওতে আমার অসুবিধে হবে না। তুমি চেষ্টা করো না?

নির্ম্মল কিছু ভাবিয়া বলিল—কিছু টাকা গোড়ায় ছাড়তে পারবে?

—কি রকম?

—তোমার কাছে আর ঢাকাঢাকি কি? কিছু টাকা পাণ খাওয়াতে হবে, এই···বোঝো তো সব।

—কত?

—সে তোমায় বলবো। আন্দাজ শ'-পাঁচেক—কিছু বেশীও হতে পারে।

গদাধর সাগ্রহে বলিলেন—তুমি ছাখো ভাই নির্ম্মল। এ-টাকা আমি দেবো—তবে আমার আবার পুষিয়ে যাওয়া চাই তো! বুঝলে না, ঘর থেকে তো আর দেবো না!

—আমি 'সব বুঝি। সে হয়ে যাবে। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণে।

—কবে আমায় জানাবে? ওরা কিন্তু টেণ্ডার কল্ করেচে—পনেরোই তারিখের পরে আর টেণ্ডার নেবে না।

—তাহ'লে কাল আমি একবার যাই—গিয়ে দেখে আসি। কি বলো?

—বেশ ভাই, তাই যাও। যাতে হয়, বুঝলে তো? তোমাকে আর বেশি কি বলবো?

এই সময় অনঙ্গমোহিনী দু'খানি রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা ও হালুয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দু'জনের সামনে রেকাবি দুটি রাখিল।

নির্ম্মল হাসিমুখে বলিল—এই তো! এতেই তো আমি বৌ-ঠাকরুণকে বলি—চোখ পালটাতে না পালটাতে এত খাবার তৈরি হয়ে গেল!···তা, এত লুচি কেন আমার রেকাবিতে?

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—খান, ও ক'খানা আপনি পারবেন এখন খেতে। চা খাবেন তো?

—তা এক পেয়ালা হলে মন্দ হয় না।

স্বামীর দিকে চাহিয়া অনঙ্গ বলিল—তোমার কিন্তু দু' পেয়ালা হয়ে গিয়েচে। তোমাকে আর দেবো না।

গদাধর বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—তা যা হয় করো। তবে না হয় আধ পেয়ালা দিও।

—কিছু না—সিকি পেয়ালাও না। রাত্রে তারপর ঘুম হবে না —মনে নেই?

অনঙ্গ মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—টাকাটার তাহ'লে জোগাড় ক'রে রেখো।

—শ'-পাঁচেক তো? ও আর কি জোগাড় করবো, গদির ক্যাশ থেকে নিলেই হবে নিজনামে হাওলাত লিখে।

—তাহ'লে কাল একবার যাই, কি বলো?

—হ্যাঁ যাবে বই কি—নিশ্চয় যাবে।

অনঙ্গ চা লইয়া আসিল। গদাধরের জন্য আনে নাই, শুধু

নির্ম্মলের জন্য। গদাধর জানেন তাঁহার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খুঁটিনাটি লইয়া স্ত্রী বড়ই নির্ম্মম—এখানে হাজার চাহিলেও চা মিলিবে না। সুতরাং তিনি এ-বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। নির্ম্মল বলিল—চলো বৌ-ঠাকরুণ, একদিন সবাই মিলে আড়ংঘাটায় 'যুগলকিশোর' দেখে আসি।

—বেশ তো, চলুন না।

গদাধর বলিলেন—সে এখন কেন? জষ্টি মাসে দেখতে হয় তো।—

যুগল দেখিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে
পতিসহ থাকে স্বর্গবাসে।

স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—অতএব তোমার যদি আমার সঙ্গে স্বর্গবাসে মন থাকে, তাহ'লে—

অনঙ্গ সলজ্জ মুখে বলিল—যাও, সব-তাতেই তোমার ইয়ে! আমরা এখুনি যাবো—চলো না। পরে আবার জষ্টি মাসে গেলেই হবে। আমি কখনো দেখিনি—জষ্টি মাস পর্য্যন্ত বাঁচি কি মরি!

নির্ম্মল বলিল—ও আবার কি অলুক্ষুণে কথা! মরবেন কেন ছাই! বালাই···ষাট্···

অনঙ্গ হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—আমিও ভাই এবার চলি, কাজ আছে, একবার শিবুর মায়ের কাছে যাবো। বুড়ী আজ ক'দিন ধ'রে রোজ ডেকে পাঠাচ্ছে, তার ছেলের সন্ধান ক'রে দিতে হবে। দেখি গিয়ে।

—ভালো কথা, তার আর কোনো সন্ধান পাওনি?

—সন্ধান আর কি পাবো ? কলকাতাতেই আছে, চাকরি খুঁজতে গিয়েচে। দুদিন পরে এসে হাজির হবে। এক্ষেত্রে যা হয়। মামার তাড়ায় আর বকুনিতে দেশ ছেড়ে পালিয়েচে। যেমন মামা, তেমনি মামী।—এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্ !

—মাঝে প'ড়ে শিবুর মা'র হয়েছে বিষম দায়। ভাইয়ের বাড়ী প'ড়ে থাকে, সহায় সম্পত্তি নেই—এই বয়সে যায়ই বা কোথায় ? তার ওপর ছেলেটির ওই ব্যাপার !

—আচ্ছা, তাহ'লে আসি ভাই।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া গদাধর নির্ম্মলের হাতে তিনটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

—এ আবার কেন, এ আবার কেন ? বলিতে বলিতে নির্ম্মল টাকা ক'টি ট্যাকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল—গায়ে সে জামা দিয়া আসে নাই—মাত্র গেঞ্জি গায়ে আসিয়াছিল।

গদাধর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ তখনও বসিয়া বসিয়া একরাশ লুচি ভাজিতেছে। একটু বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—এ কি গো, এত লুচির ঘটা কেন আজ বলো তো ?

—কেন আর, আমি খাবো। আমার খেতে নেই ? এ সংসারে শুধু খেটেই মরবো, ভালো মন্দ খাবো না ?

—না, আজ এত কেন—তাই বলচি !

অনঙ্গ টানিয়া-টানিয়া বলিল—তুমি খাবে, আমি খাবো, ভড়মশায় খাবেন,—সবাইকে যে নেমন্তন্ন করেচি আজ, জানোনা ?

বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখে চাহিতেই গদাধর বুঝিলেন, স্ত্রীর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। স্ত্রীর এই বিশেষ ভঙ্গিটি তিনি আজ তেরো বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন—কৌতুক করিয়া মিথ্যা বলিবার পরে এই ভঙ্গিটি করিয়াই অনঙ্গ নিজের মিথ্যা নিজে ধরাইয়া আসিতেছে চিরকাল—অথচ খুব সম্ভব সে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভালোই তো। আমি কি বারণ করেচি ?

—না গো না। আজ শিবুর মাকে রাত্রে এখানে খেতে বলেচি। আহা, বুড়ীর বড় কষ্ট! ছেলেটা অম্‌নি হলো, ভাই-বউয়ের যা মুখ-ঝংকার! ক্ষুরে নমস্কার, বাবা! বুড়ীকে দাঁতে পিষতে শুধু বাকি রেখেচে! না দেয় দুটো ভালো ক'রে খেতে, না দেয় পরনে একখানা ভালো কাপড়—কি ক'রে যে মানুষ অমন পারে!

—তা বেশ, ভালো, ভালো। খাওয়াও না। আমায় আগে বললে না কেন ? একদিনের জন্যে যখন খাওয়াবে, তখন একটু ভালো করেই খাওয়াতে হয়। রাধানগর থেকে সন্দেশ মিষ্টি আনিয়ে দিতাম—হলো-বা একটু দই···

—দই ঘরে পেতেছি। খাসা দই হয়েছে। খেও একটু পাতে দেবো-এখন। মিষ্টি তো পেলাম না—নারকোলের সঙ্গে ক্ষীর মিশিয়ে সন্দেশ করবো, ভাবচি।

—এখনও করবে, ভাবচো ? কত রাত্রে বুড়ীকে খেতে দেবে ?

—সব তো হয়ে গেল। লুচি ক'খানা ভাজা হয়ে গেলেই নারকোল কুরে বেটে সন্দেশ চড়িয়ে দেবো। ক্ষীর ক'রে রেখেচি—ওগো, আমায় একটু কপ্‌পুর আনিয়ে দাও না!

—এখন কি কপ্‌পুর পাওয়া যাবে? আগে থেকে সব বলো না কেন? এ কি কলকাতা সহর? রাধানগর ভিন্ন জিনিস মেলে? দেখি, বিশুর দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েচে কিনা। যদি পাওয়া যায়, পাঠিয়ে দিচ্চি।

গদাধরের পৈতৃক-আমোলের ছোট একখানি তালুক ছিল। সেখানে ইঁহাদের একটি কাছারিঘর ও বহুকালের পুরোনো গোমস্তা বিদ্যমান।

বেশ শীত পড়িয়াছে—একদিন গদাধর স্ত্রীকে একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন—ওগো, আজ সকাল-সকাল রান্না ক'রে ফেল তো—আমপাড়া-ঢবঢবির গোমস্তা পত্র লিখেচে। কিছু আদায় তশিল দেখে আসি।

অনঙ্গ পছন্দ করে না, স্বামী কোথাও গিয়া বেশিদিন থাকে। কথা শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কতদিন থাকবে?

—তা ধরো যে-কদিন লাগে। দিন-ছ'সাত হবে বোধ হচ্চে।

—এত দিন তো কোনো কালে থাকো না। আমপাড়া-ঢবঢবি শুনেচি অতি অজ-পাড়াগাঁ। খাবে-দাবে কি? থাকবে কোথায়?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—সে ভাবনা তোমার চেয়ে আমার কম নয়, কারণ আমি সেখানে থাকবো। আমাদের সেখানে কাছারিবাড়ী

আছে, ভাবনা কি? গাঙ্গুলিমশাই বহুকালের গোমস্তা। সব ঠিক ক'রে রাখবেন।

অনঙ্গ চিন্তিত মুখে বলিল—এই সেদিন অমন সর্দ্দি-কাশি গেল, এখনও তেমন সেরে ওঠো নি। ভারী তোমাদের কাছারিঘর! টিনের বেড়া, খড়ের ছাউনি। গল্-গল্ ক'রে হিম আসে। কি ক'রে কাটাবে, তাই ভাবচি। এখন না গেলেই নয়?

—কি ক'রে না গিয়ে পারা যায়? পৌষ-কিস্তির সময় এসে পড়লো, যেতেই হবে।

—আজই কেন? কাল যেও।

—যখন যেতেই হবে, তখন আজ আর কাল ক'রে কি লাভ? বরং যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়···

—আমায় নিয়ে চলো।

গদাধর বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—তোমাকে! ঢবঢবির কাছারি-বাড়ীতে? সে জায়গা কেমন তুমি জানো না, তাই বলচো। পুরুষ-মানুষে থাকতে পারে—মেয়েমানুষ থাকবে কোথায়? একখানা মেটে ঘর। সে হয় কি ক'রে?

—অতদিন লাগিও না, দু'তিন দিনের মধ্যে এসো তবে।

—কাজ শেষ হ'লে আমি কি সেখানে ব'সে থাকবো? চলে আসবো।

গদাধর বেলা দুইটার পরে গরুর গাড়ী যোগে আমপাড়া রওনা হইলেন। ছ'সাত ক্রোশ পথ—মাঠ ও বিলের ধার দিয়া রাস্তা—ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার দিকে বেশ শীত করিতে লাগিল।

গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—সামনে তো কাপাসডাঙ্গা, তারপর নদী পেরুবি কি ক'রে? জল কত?

—জল নেই। হেঁটে পার হওয়া যায়।

নদীর ধারে মুদীর ছোট্ট দোকান। অনঙ্গ পাঁচ ছ'দিনের মত চাল, ডাল, মশলা, তেল, ঘি কিছুই দিতে বাকি রাখে নাই—তবুও গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—দেখ্‌তো, সোনা-মুগের ডাল আছে কি না দোকানে?

জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া গাড়োয়ান জানাইল, ডাল নাই

—তবে দেখ্, ভালো তামাক আছে?

জানা গেল, তামাক আছে—তবে চাষী লোকের উপযুক্ত। ভদ্র-লোক সে তামাক খাইতে পারিবে না।

গদাধর বিরক্ত-মুখে বলিলেন—পার হ দেখি—সাবধানে নামা নদীতে। আমি কি নেমে যাবো?

—নামবেন কেন বাবু? গাড়ীতে ব'সে থাকুন। ভয় নেই।

গাড়ী পার হইয়া ওপারে গেল। লম্বা শিশু-গাছের সারি···তলা দিয়া রাস্তা।

অন্ধকার নামিয়া আসিল। গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—হুঁশিয়ার হয়ে চল, এ পথ ভালো নয়।

গাড়োয়ান পিছন ফিরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই আবার সামনের দিকে মুখ ফিরাইয়া গরুর লেজ মলিতে-মলিতে বলিল—কোন্ ভয়ডার কথা বলচেন বাবু? ভূতির, না মানুষির?

—ভূতটুত নয় রে বাপু। মানুষের ভয়ই বড় ভয়।

—কোনো ডর করবেন না বাবু—সে-সব এদানি আর নেই।

—তুই তো সব জানিস্! আর-বছর চত্তির মসে এ-পথে রাধা-নগরের সাতকড়ি বসাককে খুন করে, মনে নেই?

গাড়োয়ান চুপ করিয়া রহিল। তাহাতে গদাধর যেন বেশি ভয় পাইলেন, বলিলেন—কি, কথা বলচিস্ নে যে বড়?

—কথাডা মনে পড়েচে, বাবু।

—তবে? হুঁশিয়ার হয়ে চল্।

—চলুন বাবু, যা কপালে থাকবার, হবে!

—বুঝলাম। নে, একটু তামাক সাজ দিকি। চকমকি আছে, সোলা আছে, নে···

সত্যই ঘোর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। গদাধরের হাতে টাকাকড়ি নাই সত্য—কিন্তু সোনার আংটি আছে, বোতাম আছে—সামান্য দশ-বারো টাকা নগদও আছে। পল্লীগ্রামে লুঠেরা-ডাকাতের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইহা অপেক্ষা অনেক কম অর্থের জন্যও তাহারা মানুষ খুন করিয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে।

গাড়োয়ানটা কথা বলে না কেন? গদাধর বলিলেন—কি রে, জ্বাল্লি?

—আজ্ঞে বাবু, সোলা ভিজে।

—তোর মুণ্ডু। দে, আমার কাছে দে দিকি।

গদাধরের আসল উদ্দেশ্য তামাক খাওয়া নয়, কথাবার্ত্তায় ও হাতের কাজ লইয়া ভয়ের চিন্তা ভুলিয়া অন্যমনস্ক থাকা। তামাক ধরাইয়া নিজে খাইয়া গাড়োয়ানকে কলিকা দিবার সময় যেন তাঁহার

মনে হইল রাস্তার পাশেই গাছের সারির মধ্যে সাদামত কি নড়িতেছে।

গাড়োয়ানকে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিলেন—কি রে গাছের পাশে?

গাড়োয়ান ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল—ও কিছু না বাবু। আপনি ভয় পাবেন না—এ-পথে গাড়ী চালিয়ে চালিয়ে বুড়ো হয়ে মরতি গ্যালাম, ভয়-ভীত কিছু নেই বাবু। শুয়ে পড়ুন ছইয়ের ভেতর।

কিন্তু গাড়োয়ানের কথায় গদাধরের ভয় গেল না। তিনি ছইয়ের ফাঁক দিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক দেখিতে-দেখিতে সোনা-মুড়ির ডোমপাড়ার আলো দূর হইতে দেখিলেন। আর ভয় নাই, সোনামুড়িতে লোকজনের বাস আছে—মধ্যে একটা বড় মাঠ—তার-পরেই ঢবঢবির বিল চোখে পড়িবে।

সোনামুড়ি গ্রামে ঢুকিতেই দেখা গেল, তাঁহার কাছারির পিয়াদা মাণিক সেখ লণ্ঠন হাতে আসিতেছে তাঁহাদের আগাইয়া লইতে।

মাণিক সেলাম করিয়া বলিল—বাবু আসচেন?

—হ্যাঁ রে···গোমস্তামশায় কোথায়?

—কাছারিতে ব'সে আছেন। বাবুর খাওয়ার জোগাড় করতি পাঠালেন মোরে—দুধের বন্দোবস্ত করতি এয়েলাম ডোমপাড়ায়।

—চ গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে।

কাছারি পৌঁছিয়া গাড়ী রাখা হইল। গদাধর নামিয়া কাছারির মধ্যে ঢুকিতেই গোমস্তা গাঙ্গুলিমশায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আসুন বাবু, আসুন! আপনার জন্যে সন্দে থেকে ব'সে আছি। এই

আসেন, এই আসেন ! বড্ড দেরি হয়ে গেল বাবুর। খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ক'রে রেখেচি।

—নমস্কার গাঙ্গুলিমশায়। ভালো আছেন ?

—কল্যাণ হোক। বসুন। ওরে, বাবুর হাত-পা ধোয়ার জল এনে দে বাইরে।

গদাধর হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আদায়পত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

রাত বেশি হইল, নিকটেই ব্রাহ্মণপাড়ায় গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী হইতে খাবার আসিল। আহারাদি সারিয়া শুইবার সময় গদাধর বলিলেন—রাত্রে এখানে মাণিক সেখকে থাকতে বলুন গাঙ্গুলিমশায়। একা থাকা, মাঠের মধ্যে কাছারি···

গাঙ্গুলিমশায় হাসিয়া বলিলেন—কোনো ভয়-ভীত নেই এখানে। মাণিকও থাকবে এখন—আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে শুয়ে পড়ুন।

গদাধর গৃহস্থ মানুষ। নিজের বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র শুইতে খুব বেশি অভ্যস্ত নহেন, তাঁহার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। এ-ধরণের ঘরে মানুষ শুইতে পারে ? টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়া হিম আসিতেছে দস্তুরমত। অনঙ্গ কাছে নাই। ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়িয়া বিশেষ করিয়া কষ্ট হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এপাশ-ওপাশ করিবার পরে গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশ হইল। শেষরাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথায় শুইয়া আছেন ? চবচবির কাছারিবাড়ীতে ? কেমন একটু ভয়-ভয় হইল। ডাকিলেন—মাণিক, ও মাণিক···

মাণিক সম্ভবতঃ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সাড়া পাওয়া গেল না।

গদাধর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোর হইলে গদাধর উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া কাছারিতে বসিলেন। প্রজাপত্র আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ একটা পাঁটা, কেহ-বা গোটাকতক ডিম, কেহ বড় একটা লাউ প্রভৃতি আনিয়াছে জমিদার-বাবুকে ভেট্ দিতে—নানাবিধ জিনিষপত্রে কাছারিঘর ভরিয়া গেল—তার মধ্যে তরি-তরকারিই বেশি।

বেলা এগারোটার মধ্যে প্রায় সাতশত টাকা আদায় হইল।

গাঙ্গুলিমশায় বলিলেন—বাবু, আপনি এসেছেন ব'লে এই আদায়টা হলো। নইলে এ টাকা আদায় হতে একমাস লাগতো। আপনাদের নামে যা হবে, আমার হাজার-বার তাগাদাতেও তা হবে না।

—আজ বাড়ী ফিরতে পারি তো?

—আরও ক'দিন থাকুন। হাজার-তিনেক টাকা এবার আদায় হয়ে যাবে। প্রজার অবস্থা এবার ভালো।

গদাধর প্রমাদ গণিলেন। একটা রাত যে-কষ্টে কাটাইয়াছেন প্রবাসে, আরও কয়েক রাত কাটাইতে হইলেই তো তিনি গিয়াছেন! এমন ঘরে বেশি দিন বাস করা যায়? বিশেষ এই শীতকালে? গদাধরের পিতাঠাকুর বৎসরে দু'বার করিয়া এখানে তাগাদায় আসিতেন—তিনি এই বছর-পাঁচেক পরলোকগত হইয়াছেন—ইহার মধ্যে গদাধর আসিয়াছেন বছর-দুই পূর্ব্বে একবার, আর একবার এই এখন। গোমস্তা পত্র লিখিয়া আসিতে পীড়াপীড়ি না করিলে তিনি বড়-একটা এখানে আসিতে চাহেন না। আরামে মানুষ হইয়াছেন, এমন ধরণের কষ্ট তাঁহার সহ্য হয় না!

আরও তিন দিন কাটাইয়া প্রায় দেড়-হাজার টাকা আদায় হইল। গাঙ্গুলিমশায় খুব খুশী। কাছারিতে একদিন ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। মাতব্বর প্রজারা জমিদারের নিমন্ত্রণে কাছারিবাড়ী আসিয়া পাত পাড়িয়া খাইয়া গেল। গদাধর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের খাওয়ানোর তদারক করিতে লাগিলেন।

সব মিটিয়া গেলে গদাধর গাঙ্গুলিমশায়কে ডাকিয়া বলিলেন—তাহ'লে আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন এবার।

—আজ হয় না বাবু, আজ রাত্রে আমার বাড়ী সত্যনারায়ণ পূজো—আপনাকে একবার সেখানে যেতে হবে।

—বেশ, তবে কাল সকালেই গাড়ীর ব্যবস্থা রাখবেন।

—কাল আপনি যাবেন, সঙ্গে আমিও যাবো। অতগুলো টাকা নিয়ে আপনাকে একলা যেতে দেবো না, বাবু।

সন্ধ্যার পরে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী বেশ-সমারোহের সহিত সত্য-নারায়ণের পূজা হইল। গ্রামের সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ শেষ করিয়া গাঙ্গুলিমশায় উঠানে গ্রাম্য তর্জ্জা-দলের আসর পাতিয়া দিলেন। ঘুমে চোখ ভাঙিয়া আসা সত্বেও গদাধরকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত বসিয়া তর্জ্জা শুনিতে হইল—পাঁচ টাকা বখশিশও করিতে হইল—জমিদারি চাল বজায় রাখিতে।

সকালে রওনা হইয়া গদাধর বেলা দশটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছিয়া গেলেন। পাঁচ দিন মাত্র বাহিরে ছিলেন—যেন কতকাল বাড়ী ছাড়িয়াছেন, যেন কতকাল দেখেন নাই স্ত্রী-পুত্রকে। ছোট ছেলে

টিপুকে দেখিয়া কাছে বসাইয়া আদর করিয়া তবে মনে হইল, নিজের বাড়ীতেই আসিয়াছেন বটে—কতকাল পরে যেন।

অনঙ্গ আসিয়া বলিল—এতদিন থাকতে হবে ব'লে গেলে না তো! ভালো ছিলে? আমি কাল-পরশু কেবল ঘর-বার করেচি,—এই তুমি আসচো···এই তুমি আসচো! তা, একটা খবরও তো দিতে হয়!

দুজনে কেহ কখনও কাহাকে ফেলিয়া দীর্ঘদিন থাকে নাই, থাকিতে অভ্যস্ত নয়—নিতান্ত ঘরকোনা গৃহস্থ বলিয়া—পাঁচ দিনের অদর্শন ইহাদের পরস্পরের পক্ষে পাঁচ মাসের সমান!

অনঙ্গ এই পাঁচ দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। সেখানে কি-রকম খাওয়া-দাওয়া, কে রাঁধিল, থাকার জায়গার সুবিধা কেমন—ইত্যাদি। গদাধরও সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন এই পাঁচ দিনের ব্যাপার—যেন তিনি কাশ্মীর ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া ফিরিলেন!

অনঙ্গ বলিল—ক'দিন ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়নি, আজ কি খাবে, বলো?

—যা হয় হবে, আগে একটু চা।

—এত বেলায়? সেখান থেকে চা খেয়ে বেরোওনি? গা ছুঁয়ে বলো তো।

—ওই অমনি এক পেয়ালা।

—এখন আর চা খায় না।

—ওই তো তোমার দোষ। গরুর গাড়ীতে এলাম শরীর ব্যথা ক'রে,—একটু গরম চা না হ'লে···

—আচ্ছা, তবে আধ-পেয়ালা দেবো, তার বেশি কক্ষনো পাবে না।

গদাধর এ-কথা বলিলেন না যে, গত পাঁচ দিন কাছারিবাড়ীতে মনের সাধ মিটাইয়া এবেলা চার পেয়ালা ওবেলা চার পেয়ালা প্রতিদিন চালাইয়াছেন! আজও সকালে আসিবার আগে দুটি পেয়ালা উজাড় করিয়া তবে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন।

অনঙ্গ চা আনিয়া দিয়া বলিল—নির্ম্মল তোমায় খুঁজে-খুঁজে হয়রান।

—কেন?

—তা আমায় বলেনি, রোজ এসে বলে—বৌদি, আজ এ খাওয়াও, বৌদি, আজ ও খাওয়াও—বিরক্ত করেচে!

—তাতে কি হয়েচে! বন্ধুলোক—খাবে না? আদর ক'রে কেউ খেতে চাইলে···

—সে আমি জানি গো, জানি। তোমার বন্ধু খেতে পায়নি, তা নয়। আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। খেতে চেয়ে কেউ পায় না, এমন কখনো হয়নি আমার কাছে।

—সে-কথা যাক্। এখন আমাকে কি খেতে দেবে, বলো?

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—এখন বলবো না, খেতে ব'সে দেখবে।

—কি, শুনি না?

—পিটে-পুলি, পায়েস।

—খুব ভালো—সেখানে ব'সে-ব'সে ভাবতাম, শীতকালে একদিন পিটে মুখে ওঠেনি এখনও।

—যত খুশী খেও-এখন।

স্ত্রীর সেবা-যত্নের হাত ভালো। অনঙ্গ কাছে বসিয়া স্বামীকে যত্ন করিয়া খাওয়াইল—পান সাজিয়া ডিবায় আনিয়া বিছানার পাশে রাখিয়া বলিল—ঘুমোও একটু। গাড়ীতে আসতে বড্ড কষ্ট হয়েচে, না ?

গদাধর আদর বাড়াইবার জন্য বলিলেন—পিঠটায় যা ব্যথা হয়েছে —একেবারে শিরদাঁড়ায়। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে···

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বলিল—এতক্ষণ বলোনি কেন ? দাঁড়াও, তেল গরম ক'রে আনি।

—এখন থাক্। ঘুমিয়ে উঠি, তারপর।

—আমি যাই, মশারি ফেলে দিয়ে আসি। মাছি লাগবে।

গদাধরের ঘুম ভাঙিল বৈকালের দিকে। সত্যই গায়ে ব্যথা হইয়াছে বটে, তিনি যে স্ত্রীকে নিতান্ত মিথ্যা বলিয়াছেন—এখন দেখা যাইতেছে, তাহা নয়। সেদিন সন্ধ্যার দিকে গদাধরের জ্বর আসিল। রাত্রে কিছু খাইলেন না—অনঙ্গ ডাক্তার ডাকাইল। কুইনাইনের ব্যবস্থা হইল। কারণ, ডাক্তারের মতে এটা খাঁটি ম্যালেরিয়া-জ্বর ছাড়া আর কিছু নয় !

পরদিন সকালে নির্ম্মল দেখা করিতে আসিল। অনঙ্গ তখন সেখানে ছিল না, গদাধর বলিলেন—ওদিকে কিছু হলো ?

—এবার কিছু টাকা ছাড়ো···হয়েছে একরকম।

—কত ?

—তা আমি অনেক কষ্টে শ’-পাঁচেকে দাঁড় করিয়েছি।

—কাজ কেমন পাওয়া যাবে? টেণ্ডার পাঠিয়ে দিয়েচি।

—হাজার পাঁচ-ছয় টাকার কাজ হবে, মনে হচ্ছে!

—তাহ’লে একরকম পোষাতে পারে। তবে একটা কথা, তোমার বৌদিদি যেন না টের পায়!

নির্ম্মল ধূর্ত্তের হাসি হাসিয়া বলিল—আমি এত কাঁচা ছেলে, তুমি ভেবো না। কাক-পক্ষীতে জানতে পারবে না।

—কাল বিকেলের দিকে এসো। টাকার জোগাড় ক’রে রেখে দেবো।

দুই

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

একদিন গদিতে গদাধর উপস্থিত আছেন, ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ তো সব বিলি হয়ে গেল, বাবু, আজ আমার শালার কাছে খবর পেয়েচি। আপনার কিছু হয়েচে?

—হয়েচে, তবে খুব বেশি নয়। হাজার-দুই টাকার কাজ পাওয়া গিয়েচে।

—যাহয় তবু কিছু আসবে-এখন।

গদাধর অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—তা তো বটেই।

ইতিপূর্ব্বেই তিনি মনে-মনে হিসাব কষিয়া দেখিয়াছেন—এ-কাজে তাঁহার বিশেষ কোনো লাভ হইবে না। পাঁচশত টাকা ঘুষ দিয়াও

নির্ম্মল ইহার বেশি কাজ জোগাড় করিতে পারে নাই—সে যত বলিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক কাজও পাওয়া যায় নাই।

নির্ম্মল নিজেও সেজন্য খুব লজ্জিত। কথাটা অবশ্য গদাধর কাহাকেও বলেন নাই—নির্ম্মল বন্ধুলোক, সে যদি চেষ্টা করিয়াও কাজ না পাইয়া থাকে তবে তাহার আর দোষ কি?

কিন্তু চতুর ভড়মশায় একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো, ভাবচি। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি, বলুন?

—নির্ম্মলবাবুকে কি কিছু টাকা দিয়েছিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজের জন্যে?

—না, কে বললে?

—আমি এমনি জিগ্যেস্ করচি বাবু। তাহ'লে কথাটা সত্যি নয়? থাক্, তবে আর ও-কথার দরকার নেই।

গদাধর চাহেন না, ইহা লইয়া নির্ম্মলকে কেহ কিছু বলে। এ-কথা শুনিলে অনেকে অনেক রকম কথা বলিবে, তিনি জানেন—সুতরাং এ-বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। ভড়মহাশয়ও নিজের হিসাবের খাতায় মনোনিবেশ করিলেন।

গদাধর অভাবগ্রস্ত লোক হইলে হয়তো এ-সব কথায় তাঁহার খট্‌কা লাগিত। কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় এই পল্লীগ্রামে বসিয়া তাঁহার মাসে চার-পাঁচশো টাকা আয়। পল্লীগ্রামের পক্ষে এ-আয় কম নয়। সংসারে খরচও এমন কিছু বেশি নয়—কিছু দান-ধ্যানও আছে। টাকার যে মূল্য অপরে দিয়া থাকে, গদাধরের কাছে টাকার হয়তো তত মূল্য নাই!

অনঙ্গ একদিন বলিল—আচ্ছা, এবার আমাদের বাসন্তীপূজোটা করলে হয় না ?

গদাধর বলিলেন—তোমার ইচ্ছে হয় তো করি।

—আমার কেন ? তোমার ইচ্ছে নেই ?

—পূজো-আচ্চা বিষয়ে তুমি যা বলো। আমি একটু অন্যরকম, জানোই তো।

—পূজো হোক্, আর কাঙালী-ভোজন করানো যাক্, কি বলো ?

—তাতে আমার অমত নেই।

—ভালো কারিগর এনে ঠাকুর গড়াও···কেষ্টনগরের কারিগর আনালে কেমন হয় ?

—তুমি যা বলো ! বলেচি তো, ও-বিষয়ে আমি কোনো কথা বলবো না।

গদাধর জানেন, স্ত্রীর ঝোঁক আছে এদিকে। লোককে খাওয়াইতে-মাখাইতে সে ভালোবাসে। এ-পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাড়ী অতিথি আসিয়া ফেরে নাই—যত বেলাতেই আসুক না কেন, অনঙ্গ অনেক সময় মুখের ভাত অতিথিকে খাওয়াইয়া, নিজে মুড়ি খাইয়া একবেলা কাটাইয়াছে। কারণ, অত বেলায় কে আবার রান্নার হাঙ্গামা করে ? এ-সব বিষয়ে গদাধর কোনো কথা বলিতেন না। স্ত্রী যা করে, করুক।

অনেকদিন আগের কথা।

অনঙ্গ তখন ছেলেমানুষ—সবে নববধূ-রূপে এ-বাড়ীতে পা দিয়াছে। একদিন কোথা হইতে দুটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক আসিয়া অন্নপ্রার্থনা

করিল। বেলা তখন দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গদাধরের মা বলিয়া পাঠাইলেন, এমন অসময়ে এখানে কিছু হইবে না।

অনঙ্গ শাশুড়ীকে বলিল—মা, একটা কথা বলবো ?

—কি বৌমা ?

—আমার ভাত এখনও রয়েচে। মাথাটা বড্ড ধরেচে, আমি আর এবেলা খাবো না, ভাবচি। ওই ভাত ওদেরকেই দিয়ে দিন না ?

বধূর এ-কথায় শাশুড়ী কিন্তু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—ও আবার কি কথা বৌমা ? মুখের ভাত ধ'রে দিতে হবে কোন্ জগন্নাথ-ক্ষেত্তরের পাণ্ডা আমার এসেচেন ! রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে। এবেলা না খাও, ওবেলা খাবে, ঢেকে রাখো, মিটে গেল।

কিন্তু অনঙ্গ পুনরায় বিনীতভাবে বলিল—তা হোক মা, আপনার পায়ে পড়ি। ওদের দিয়ে দিই। আমার খিদে নেই—সত্যি।

শাশুড়ী অগত্যা বধূর কথামত কার্য্য করিলেন।

গদাধর অনঙ্গকে এ-সব বিষয়ে কখনো বাধা দেন নাই, তবে অতিরিক্ত উৎসাহও কখনো দেন নাই—তাহাও ঠিক। নিজে তিনি ব্যবসায়ী লোক, অর্থাগম ছাড়া অন্য-কিছু বড় বোঝেন না—আগে-আগে পড়াশুনার বাতিক ছিল, কারণ গদিয়ান ব্যবসাদার হইলেও তিনি গোয়াড়ি কলেজ হইতে আই, এ, পাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি টাকা উপার্জ্জনের নেশায় জীবনের অন্য-সব বাতিক ধামা চাপা পড়িয়াছে।

অনঙ্গ নিজেও বড়-ঘরের মেয়ে। তাহার পিতা নফরচন্দ্র মিত্র একসময়ে রাধানগর পরগণার মধ্যে বড় তালুকদার ছিলেন। ভূসি-মালের ব্যবসা করিয়াও বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন—কিন্তু

শেষের দিকে বড় ছেলেটি উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির হইয়া নানারকম বদখেয়ালে টাকা নষ্ট করিতে থাকে, বৃদ্ধও মনের দুঃখে শয্যাগত হইয়া পড়েন। ক্রমে একদিকের অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায়। গত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অনঙ্গ তাহার এই দাদাকে খুব ভালোবাসিত। নানারকমে তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াও শেষ-পর্য্যন্ত কিছুই হইল না—তাই সে এখন মনের দুঃখে বাপের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। তাহার দাদাও ভগ্নীপতির গৃহে কালে-ভদ্রে পদার্পণ করে।

গদাধর বোঝেন ব্যবসা, পয়সা উড়াইবার মানুষ তিনি নহেন! কোনো প্রকার সৌখিনতাও নাই তাঁহার। এমন কি, হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও বাড়ী-ঘর কেন সারাইতেছেন না—ইহা লইয়া ঘরে-পরে বিস্তর অনুযোগ সহ্য করিয়াও তিনি অটল। তাঁর নিজের মত এই যে, চলিয়া যখন যাইতেছে, তখন এই অজ পাড়াগাঁয়ে ঘর-বাড়ীর পিছনে কতকগুলো টাকা ব্যয় করিয়া লাভ নাই!

একদিন তাঁহার এক আত্মীয় কী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী-ঘর দেখিয়া বলিল—গদাধর, বাড়ী-ঘর এমন অবস্থায় রেখেচো কেন?

—কেন বলো তো?

—জানলা নেই—চট টাঙিয়ে রেখেচো, দেওয়াল প'ড়ে গিয়েচে, দরমার বেড়া—তোমার মত অবস্থার লোকে কি এরকম করে?

—তুমি কি বলো?

—ভালো ক'রে বাড়ী করো, পূজোর দালান দাও, বৈঠকখানা ভালো ক'রে করো—তবে তো জমিদারের বাড়ী মানাবে।

—হ্যাঁঃ, পাগল তুমি! কতকগুলো টাকা এখানে পুঁতে রাখি!

—তা, বাস করতে গেলে করতে হয় বইকি। এতে লোকে বলে কি?

—যা বলে বলুকগে। তুমিই ভেবে গ্যাখো না ভাই, এই বাজারে কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে এখানে ওসব ধুমধামের কি দরকার আছে?

—এই বাড়ীতে চিরকাল বাস করবে? পৈতৃক-বাড়ী ভালো ক'রে তৈরি করো—দশজনের মধ্যে একজন হয়ে বাস করো।

—এখানে আর বড় বাড়ী ক'রে কি হবে? চলে তো যাচ্চে। সে টাকা ব্যবসাতে ফেললে কাজ দেবে। ইট গেড়ে টাকা খরচ করা আমার ইচ্ছে নয়।

তবে গদাধরের একটা সৌখিনতা আছে এক বিষয়ে। পায়রা পুষিতে তিনি খুব ভালোবাসেন—ছাদে বাঁশ চিরিয়া পায়রার জায়গা করিয়া রাখিয়াছেন—নোটন্ পায়রা, ঝোটন্ পায়রা, তিলে খেড়ি, গিরেবাজ—শাদা, রাঙা, সবুজ সব রংয়ের পায়রার দিনরাত ডানার ঝাপট, উড়ন্ত পালকের রাশি ও অবিশ্রান্ত বক্‌বক্ শব্দে গদাধরের ভাঙা অট্টালিকার কার্নিশ, থামের মাথা ও ছাদ জমাইয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার বিশ্বাস, পায়রা যেখানে, লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা!

পায়রার সখে বছরে কিছু টাকা খরচ হইয়াও যায়। পায়রার প্রধান দালাল নির্ম্মল—সে কলিকাতা হইতে ভালো পায়রার সন্ধান মাঝে-মাঝে আনিয়া, টাকা লইয়া গিয়া কিনিয়া আনে। অনঙ্গ এজন্য নির্ম্মলের উপর সন্তুষ্ট নয়। সে পায়রার কিছু বোঝে না, ভাবে, নির্ম্মল ফাঁকি দিয়া স্বামীর নিকট হইতে টাকা আদায় করে।

দুপুরের দিকে অনঙ্গ স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল—তুমি আজকাল আমার সঙ্গে কথাও বলো না···

—কে বলেচে, বলিনে ?

—দেখতেই পাচ্চি। কাছে বসলে বিরক্ত হও !

—ওটা বাজে কথা। আসল কথাটা বলো, কি ? মতলবটা কি ?

—আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দাও।

—অনেকক্ষণ বুঝেছি, এইরকম একটা কিছু হবে।

—দেবে ?

—কি হবে, শুনি ?

—তা বলবো না।

গদাধর হাসিয়া স্ত্রীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন—তবে যদি আমিও বলি, দেবো না ?

অনঙ্গ ডান হাতে ঘুসি পাকাইয়া তক্তাপোষের উপরে কিল মারিয়া বলিল—আলবাৎ দেবে, দিতেই হবে।

—কখন দরকার ?

—আজই। এক জায়গায় পাঠাবো।

গদাধর বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—পাঠাবে ? কোথায় পাঠাবে ?

অনঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও বিমর্ষ ভাবে বলিল—দাদার কাছে।

গদাধর আর কোনো কথা কহিলেন না। শুধু বলিলেন—আচ্ছা, গদ্দিতে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো-এখন।

তাঁহার এই বড় শালাটি মানুষ নয়, টাকা উড়াইতে ওস্তাদ। বাপের অতবড় বিষয়টা নষ্ট করিয়া ফেলিল এই করিয়া। ছোট বোনের কাছে মাঝে-মাঝে হয়তো অভাব জানায়—স্নেহময়ী অনঙ্গ মাঝে-মাঝে কিছু দেয় দাদাকে—ইহা লইয়া গদাধর বেশি ঘাটাঘাঁটি করিতে চান না।

কিন্তু একদিন এমন একটি ব্যাপার ঘটিল, যাহা গদাধর কখনো কল্পনা করেন নাই! বৈকালের দিকে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি গদির দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একখানি গরুর গাড়ী তাহার বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া, পিছন ফিরিয়া সেখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী তাঁহার বাড়ীর সামনে থামিল। দূর হইতে তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন—একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিল। পুরুষটিকে তাহার বড় শালা বলিয়া বোধ হইল—কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে? বড শালা তো বিপত্নীক আজ বছর-দুই…ও-বয়সের অন্য কোনো মেয়েও তো শ্বশুরবাড়ীতে নাই।

গদাধর একবার ভাবিলেন, বাড়ীতে গিয়া দেখিবেন নাকি? পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া গদির দিকে চলিলেন। দরকার নাই ওসব হাঙ্গামার মধ্যে এখন যাওয়ার। গদিতে গিয়াই লোক দিয়া পঞ্চাশটি টাকা স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গদির কাজ শেষ হইতে একটু রাত হইয়া গেল।

গদাধর বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিলেন, যদি শালাটি বাড়ীতে থাকে, তবে তো মুস্কিল! বড় শালাটি তাঁহার আসে বটে, কিন্তু গদাধরের সঙ্গে তাহার তত সদ্ভাব নাই। থাকিলেই আতিথ্যের খাতিরে কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে—কিন্তু তিনি সেটা অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তার চেয়ে নির্ম্মলের বাড়ী বেড়াইয়া একটু রাত করিয়া ফেরা ভালো।

নির্ম্মল বলিল—কি ভাই, বড় ভাগ্যি যে আবার তুমি এসেছো!

—একটু দাবা খেলবে?

—খেলো। চা খাবে?

—নিশ্চয়ই। চা খাবো না কি-রকম?

নির্ম্মলের অবস্থা ভালো নয়। পাঁচিল-ঘেরা উঠানের তিনদিকে তিনখানি খড়ের ঘর, একখানি ছোট রান্নাঘর—পিছনদিকে পাত-কূয়া ও গোয়াল। ঘরে আসবাবপত্রের অবস্থা হীন, তক্তাপোষের উপর ময়লা কাঁথাপাতা বিছানা। এতখানি রাত হইয়া গিয়াছে অথচ এখনও বিছানা কেহ পাট করিয়া পাতে নাই—সকালবেলার দিকে যে লেপখানা উল্টাইয়া ফেলিয়া বিছানা ছাড়িয়া লোক উঠিয়া গিয়াছে—সেখানা এত রাত পর্য্যন্ত সেই একই অবস্থায় পড়িয়া। ইহাতে আরও মনে হয়, বাড়ীর মেয়েরা, বিশেষ গৃহকর্ত্রী অগোছালো।

গদাধরকে সেই তক্তাপোষেরই একপাশে বসিতে হইল।

নির্ম্মল বলিল—ওহে, একটা কথা শুনেচো? মঙ্গলগঞ্জের কুঠী-বাড়ী বিক্রি হচ্ছে!

—কোথায় শুনলে ?

—রাধানগর থেকে লোক গিয়েছিল আজ কোর্টের কাজে—সেখানে কার মুখে শুনেচে !

—বেচবে কে ?

—মালিকের ছেলে স্বয়ং। কিনে রাখো না, বাড়ীখানা।

—হ্যাঁ! আমি অত-বড় বাড়ী কিনে কি করবো? তার ওপর পুরোনো বাড়ী। একবার ভাঙতে সুরু হ'লে, সারাতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে। লোক নেই, জন নেই—নির্জ্জন জায়গায় বাড়ী। ভূতের ভয়ে দিনমানেই গা ছম্‌ছম্ করবে।

—আরে, না না—নদীর ওপর অমন খোলা আলো-বাতাসওয়ালা চমৎকার জায়গা। কিনে রাখো। সস্তায় হবে। আমার লোক আছে।

—কি-রকম ?

—মালিকের ছেলের সঙ্গে আমার মামাতো-ভাই শচীনের খুব আলাপ। তাকে দিয়ে ধরতে পারি।

—কত টাকায় হতে পারে, মনে হয় ?

—তা এখন কি ক'রে বলবো ? তুমি যদি বলো, তবে জিগ্যেস্ করি।

এইসময় নির্ম্মলের স্ত্রী সুধা চা ও বাটিতে তেল-মাখা মুড়ি লইয়া আসিল। গদাধর বলিলেন—এই যে সুধা বৌ-ঠাকরুণ, আজকাল আমাদের বাড়ীর দিকে যাও-টাও না তো ?

সুধা একসময়ে হয়তো দেখিতে মন্দ ছিল না—বর্ত্তমানে সংসারের অনটনে ও খাটাখাটুনিতে, তার উপর বৎসরে-বৎসরে সন্তান-প্রসবের ফলে যৌবনের লাবণ্য ঝরিয়া গিয়া দেহের গড়ন পাক্‌সিটে ও মুখশ্রী প্রৌঢ়ার মত দেখিতে হইয়াছে—যদিও সুধার বয়স এই ত্রিশ। সুধা হাসিয়া বলিল—কখন যাই বলুন? সংসারের কাজ নিয়ে সকাল থেকে সন্দে পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলতে পারিনে। শাশুড়ী মরে গিয়ে অবধি দেখবার লোক নেই আর কেউ। আপনার বন্ধুটি তো উঁকি মেরে দেখেন না, সংসারের কেউ বাঁচলো না মোলো! এত রাত হয়ে গেল—এখনও রান্না চড়াতে পারিনি, বিছানা গোছ করতে পারিনি! আপনি এই বিছানাতেই বসেচেন! আমার কেমন লজ্জা করচে।

—না, না, তাতে কি, বেশ আছি।

—মুড়ি এনেছি, কিন্তু আপনার জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। আপনি কি তেল-মাখা মুড়ি খাবেন?

—কেন খাবো না? আমি কি নবাব খান্‌জা খাঁ এলাম নাকি? বৌ-ঠাকরুণ দেখছি হাসালে।

—তা নয়, একদিন মুড়ি খাইয়ে শরীর খারাপ করিয়ে দিলে, অনঙ্গ-দি আমায় ব'কে রসাতল করবে!

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—দোহাই বৌ-ঠাকরুণ, তাকে আর যাই বলো বলবে—কিন্তু এই চা-খাওয়ানোর কথাটা যেন কক্‌খনো তার কানে না যায়, দেখো। তাহ'লে তোমার একদিন—আমারও একদিন!

আরো ঘণ্টাখানেক দাবা খেলিবার পরে গদাধর বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীর চারিধারে বাঁশবনের অন্ধকারে ভালো পথ দেখা যায় না। বাড়ী ঢুকিবার পথে সেই গরুর গাড়ীখানা দেখিতে পাইলেন না।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ বসিয়া-বসিয়া সেলাই করিতেছে—ঘরে কেহ নাই। গদাধর বলিলেন—রান্না হয়ে গিয়েচে?

অনঙ্গ মুখ তুলিয়া বলিল—এসো। এত রাত?

—নির্ম্মলের বাড়ী দাবা খেলতে গিয়েছিলুম।

—হাত-মুখ ধোবার জল আছে বাইরে, দোরটা বন্ধ ক'রে দাও! বড্ড শীত।

গদাধর আড়চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার অনাহূত অতিথির চিহ্নও নাই কোনো দিকে! তবে কি চলিয়া গেল? কিংবা বোধহয় পাশের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অছিলায় পাশের ঘরে গিয়া, সেখানেও কাহাকে দেখিলেন না।

অনঙ্গ ডাকিল—খাবে এসো।

গদাধর এ-সন্দ ও-সন্দ করিতে-করিতে খাইয়া গেলেন। নিজ হইতে তিনি কোনো কথা তুলিলেন না, বা অনঙ্গও কিছু বলিল না। আহারাদি শেষ করিয়া গদাধর শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ব্যাপারখানা কি? বড় শালা কাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসিল···সে গেলই-বা কোথায়···তাহার আসিবার উদ্দেশ্যই-বা কি···অনঙ্গ কিছু বলে না কেন?

সে রাত্রি এমনি কাটিয়া গেল।

পরদিন গদাধর চা খাইতে বসিয়াছেন সকালে, অনঙ্গ সামনে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—ওগো, একটা কাজ ক'রে ফেলেচি—বকবে না, বলো ?

—কি ?

—আগে বলো, বকবে না ?

—তা কখনো হয় ? যদি মানুষ-খুন ক'রে থাকো, তবে বকবো না কি-রকম ?

—সে-সব নয়। কাল দাদা এসেছিল, তার একশো টাকার নাকি বড্ড দরকার ! তোমাকে লুকিয়ে দিতে বলে। আমি তোমাকে লুকিয়ে কখনো কোনো কাজ করেচি কি ? এ-টাকাটা আমি দিয়েছি কিন্তু।

—খুব অন্যায় কাজ করেচো। এ টাকা সেই পঞ্চাশ টাকা বাদে ?

—হ্যাঁ—না—হ্যাঁ, তা বাদেই !

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। পঞ্চাশ টাকা তিনি স্বেচ্ছায় দিয়া গেলেন, ইহাই যথেষ্ট। আবার তাহা বাদে আরও একশো টাকা লোকটা ঠকাইয়া আদায় করিয়া লইয়া গেল ! তিনি গরুরগাড়ী হইতে শালাকে নামিতে দেখিয়া তখনই ফিরিয়া আসিলেই পারিতেন—তাহা হইলে এই একশো টাকা আক্কেল-সেলামি দিতে হইত না। বলিলেন—সে গুণ্ডাটা একা ছিল ?

—ও আবার কি-ধরণের কথা দাদার ওপর ! অমন বলতে নেই, ছিঃ ! হাজার হোক, আমার দাদা, তোমার গুরুজন।

আমাদের আছে, আত্মীয়-স্বজনের বিপদে-আপদে হাত পেতে যদি কেউ চায়, দিতে দোষ নেই। দাদার সম্বন্ধে অমন বলতে আছে? তার বুঝ সে বুঝবে—আমরা ছোট হতে যাই কেন?

গদাধর আরও রাগিয়া বলিলেন—টাকা আমার গুণ্ডাবদমাইসদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্যে হয়নি তো? কেন বলবো না, একশোবার বলবো। এ কেমন অত্যাচার, শুনি? আছে বলেই ভগ্নীপতির কাছ থেকে তার সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে যাবে?

—সিন্দুক ভেঙে তো নেয়নি—কেন মিছে চেঁচামেচি করছো!

—আমি এসব পছন্দ করিনে। সৎকাজে টাকা ব্যয় করতে পারা যায়—তা ব'লে এই সব জুয়োচোর আর গুণ্ডাকে···

—আবার ঐ-সব কথা দাদাকে? ছিঃ, অমন বলতে নেই। টাকা গেল-গেল, তবু তো লোকের কাছে ছোট হলাম না।

—এ আবার কেমন বড় হওয়া? তোমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়ে গেল টাকাটা! আমি থাকলে···

—যাক্, আর কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার কোরো না। হাজার হোক, আমার দাদা···

—একা ছিল?

—কেন?

—বলো না।

—সে কথা বললে আরও রাগ করবে। সঙ্গে কে একজন মাগী ছিল, আমি তাকে চিনিনে। আমার মনে হলো, ভালো নয়। আমি তাকে ঘরে-দোরে ঢুকতে দিইনি। অমন ধরণের মেয়েমানুষ

দেখলে আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে। সে বাইরে বসেছিল। ভদ্রতার খাতিরে চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলাম—বাইরে ব'সে খেলে।

—কোত্থেকে তাকে জোটালে তোমার দাদা?

—কি ক'রে জানবো? তবে আমার মনে হলো, টাকাটা ওই মাগীকেই দিতে হবে দাদার। ভাবে তাই মনে হলো। দাদা দেনদার, মাগী পাওনাদার—দাদার মুখ দেখে মনে হলো, টাকা না দিলে তাকে অপমান হতে হবে।

—ওসব ঢং অনেক দেখেচি! ছি-ছি, আমার বাড়ীতে এই সব কাণ্ড! আর তুমি কি না…

—লক্ষীটি, রাগ কোরো না। আমার কি দোষ, বলো? আমি কি ওদের ডেকে আনতে গিয়েছি? আমি তাই দেখে দাদাকে এখানে থাকতে খেতে পর্য্যন্ত অনুরোধ করিনি! টাকা পেয়ে চ'লে গেল, আমি মুখে একবারও বলিনি যে, রাতটা থাকো! আমার গা-কেমন করছিল, সত্যি বলচি, মাগীটাকে দেখে!

—যাক্, খুব হয়েচে। আর কোনোদিন যেন তোমার ওই দাদাটিকে…

—আচ্ছা, সে হবে। তুমি কিন্তু কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার কোরো না, পায়ে পড়ি। চুপ ক'রে থাকো।

গদাধর আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গলগঞ্জের কুঠী সম্বন্ধে নির্ম্মল কয়েকবার তাগাদা করাতে একদিন গদাধর নৌকাযোগে কুঠীবাড়ী দেখিতে

গেলেন—সঙ্গে রহিল নির্ম্মল। নৌকাপথে দুই ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা কুঠীবাড়ীর ঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। সে-কালের আমলের বড় নীল-কুঠী—ঘাট হইতে উঠিয়া দু'ধারে ঝাউ গাছের সারি, মস্ত বাঁধানো চাতাল—বাঁ-ধারে সারি-সারি আস্তাবল ও চাকর-বাকরদের ঘর। খুব বড়-বড় দরজা জানলা। ঘর-দোরের অন্ত নাই। ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত সুবিস্তীর্ণ ছাদে উঠিলে অনেকদূর পর্য্যন্ত নদী, মাঠ, গ্রাম সব নজরে পড়ে।

দেখিয়া-শুনিয়া গদাধর বলিলেন—জায়গা খুব চমৎকার বইকি।

—দেখলে তো?

—সে-বিষয়ে কোনো ভুল নেই যে, পাঁচ হাজারের পক্ষে বাড়ী খুব সস্তা।

—এর দরজা-জানলা যা আছে, তারই দাম আজকালকার বাজারে দেড় হাজার টাকার ওপর—তা ছাড়া কড়ি বরগা, লোহার থাম, এসব ধ'রে···

—সবই বুঝলুম, কিন্তু এখানে কোনো গ্রাম নেই নিকটে, হাট নেই, বাজার নেই—এখানে বাস করবে কে? এত ঘর-দোর যে, গোলকধাঁধার মত ঢুকলে সহজে বেরুনো যায় না—এখানে কি আমাদের মত ছোট গেরস্ত বাস করতে পারে? দাসদাসী চাই, দরোয়ান-সহিস চাই, চারিদিকে জমজমাট চাই, তবে এখানে বাস করা চলে। নীলকুঠীর সাহেবদের চলেছে—তা ব'লে কি আমার চলে, না, তোমার চলে?

নির্ম্মল যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তাহ'লে নেবে না?

—তুমিই বুঝে দেখ না। নিয়ে আমার সুবিধে নেই। ভাড়াও চলবে না এখানে।

—তবু একটা সম্পত্তি হয়ে থাকতো!

—নামেই সম্পত্তি। যে-সম্পত্তি থেকে কিছু আসবার সম্পর্ক নেই, সে আবার সম্পত্তি! রেখে দাও তুমি।

কুঠীবাড়ী হইতে ফিরিবার পথে নির্ম্মল এমন একটা কথা বলিল, যাহা গদাধরের খুব ভালো লাগিল। অনেক বাজে কথার মধ্যে নির্ম্মল এবার এই একটা কাজের কথা বলিয়াছে বটে!

গদাধরের কি একটা কথার উত্তরে নির্ম্মল বলিল—ব্যবসা তাহ'লে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে চলো, সেখানে বাড়ী করো। ভাড়া হবে—থাকাও চলবে।

কোন্ সময়ে কি কথায় কি হয়, কিছু বলা যায় না। নির্ম্মল হয়তো কথাটা বিদ্রূপের ছলেই বলিল; কিন্তু গদাধরের প্রাণে লাগিল কথাটা। গদাধর নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, মঙ্গলগঞ্জের কুঠীবাড়ী একগাদা টাকা দিয়া কিনিতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার এ-কথা বোঝা উচিত ছিল যে, এখানে টাকা ঢালা আর টাকা জলে ফেলা সমান। কিন্তু, কলিকাতায় অনায়াসেই বাড়ীও করা যায়···ব্যবসাও ফাঁদা যায়। এখানে এই ম্যালেরিয়া জ্বরে বারোমাস কষ্ট পাওয়া—একটা আমোদ নেই, দুটো কথা বলবার লোক নেই···তার চেয়ে কলকাতায় যাওয়া ভালো। সেখানে ব্যবসা ফাঁদলে দু'পয়সা সত্যিকার রোজগার হয়।

নির্ম্মল বলিল—তাহ'লে কুঠীবাড়ী ছেড়ে দিলে তো?

—হ্যাঁ, এ একেবারে নিশ্চয়।

সারাপথ নির্ম্মল ক্ষুণ্নমনে ফিরিল।

বাড়ী ফিরিলে অনঙ্গ আগ্রহের স্বরে বলিল—হ্যাঁ গো, হলো? কি-রকম দেখলে কুঠীবাড়ী?

—বাড়ী খুব ভালো। তবে সে কিনে কোনো লাভ নেই। মস্ত বাড়ী, কাছে লোক নেই, জন নেই। আর সে অনেক ঘর-দোর, আমরা এই ক'টি প্রাণী সে-বাড়ীতে টিম্-টিম্ করবো—লোক-লস্কর, চাকর-বাকর নিয়ে যদি সেখানে বাস করা যায়, তবেই থাকা চলে।

অনঙ্গ বলিল—সেখানে বাস করবার জন্যেই ও বাড়ী কিনছিলে নাকি? তা কি ক'রে হয়? এখানে সব ছেড়ে কোথায় মঙ্গলগঞ্জে বাস করতে যাবো! এমন বুদ্ধি না হ'লে কি আর ব্যবসাদার? আমি ভেবেচি, কুঠীবাড়ী সস্তায় কিনে রাখবে! তা ভালোই হয়েচে, তোমার যখন মত হয়নি, দরকার নেই।

গদাধর ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথা বলেন। হঠাৎ কোনো কাজ করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। রাত্রে তিনি স্ত্রীকে কলিকাতায় যাওয়ার কথাটা বলিলেন।

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কলকাতায় যাবে? এসব ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় সুবিধে হবে?

—কেন হবে না? ব্যবসা সেখানে ভালো জমবে।

—বাসও করবে সেখানে?

—এখানে বাড়ীসুদ্ধ ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরচি, বছরে তিন-চার মাস সবাই ভুগে মরি। ছেলেদের লেখাপড়া শেখা, মানুষের মত মানুষ হবার সুবিধে, আমার মনে হয়, সেই ভালো। কাল আমি কলকাতায় ওদের আড়তে চিঠি লিখি, তারপর দু'এক দিনের মধ্যে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি।

—যা ভালো বোঝো, করো। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো?

—কি?

—এ গ্রামের বাস ছেড়ে আমাদের কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বাপ-পিতেমোর আমলের বাস এখানে···

—বাপ-পিতেমোর ভিটে আঁকড়ে থাকলে চলবে না তো! সব-দিকে সুবিধে দেখতে হবে। এখানে টাকা থাকলেও, খাটাবার সুবিধে নেই। ছেলেরা বড় হলে ওদের লেখাপড়া শেখানো—তাছাড়া অন্যরকম অসুবিধেও আছে। আমার মনে লেগেচে নির্ম্মলের কথাটা। ওই প্রথমে এ কথা তোলে।

—নির্ম্মল-ঠাকুরপোর সব কথা শুনো না—এ আমি তোমায় অনেকদিন ব'লে দিয়েচি। বড্ড ওর পরামর্শে তুমি চলো!

—কই আর শুনলুম, তাহ'লে তো ওর কথায় কুঠীবাড়ীই কিনে ফেলতুম। মিথ্যে অপবাদ দিও না, বলচি।

অনঙ্গ হাসিয়া ফেলিল।

বছর কাটিয়া গিয়া বৈশাখ মাস পড়িল।

বছরের শেষে পাট ও তিসির দরুণ হিসাব করিয়া দেখা গেল যে,

প্রায় মিট্ ছ'হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ভড়মশায় হিসাব কষিয়া মনিবকে লাভের অঙ্কটা বলিয়া দিলেন। আড়তে একদিন কর্ম্মচারীদের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হইল।

অনঙ্গ বলিল—একদিন গ্রামের বিধবাদের ভালো ক'রে খাওয়ানো আমার ইচ্ছে—কি বলো?

গদাধর খুশী হইয়া বলিলেন—ভালোই তো। দাও না খাইয়ে। কি-কি লাগবে, বলো?

সে-কার্য্য বেশ সুচারুরূপেই নিষ্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-বিধবা যাঁহারা, তাঁহারা গদাধরের বাড়ীতে খাইবেন না—অন্যত্র তাঁহাদের জন্য জিনিষ-পত্র দেওয়া হইল—তাঁহারা নিজেরা রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইবেন। বাকি সকলের জন্য অনঙ্গ নিজের বাড়ীতেই ব্যবস্থা করিল।

সেই রাত্রেই গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—সব ঠিক ক'রে ফেলি, বলো—তুমি কথা দাও।

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি ঠিক করবে? কি কথা?

—এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে আড়ত খুলি। ছাখো, এবারকার লাভের অঙ্ক দেখে আমার মনে হচ্ছে, এই আমাদের ঠিক সময়। আমাদের সামনে ভালো দিন আসচে। পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে থাকলে ছোট হয়ে থাকতে হবে। কলকাতায় যেতেই হবে।

—আচ্ছা, এ পরামর্শ কে দিলে বলো তো সত্যি ক'রে?

—অবিশ্যি নির্ম্মল বলছিল, তাছাড়া আমারও ইচ্ছে।

—তুমি যা ভালো বোঝো করবে, এতে আমার বলবার কিছু নেই—কিন্তু গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে চ'লে যাবে, তাই বলছিলুম! এই ছ্যাখোনা কেন, আজ সব এ-পাড়ার ও-পাড়ার বিধবারা এখানে খেলেন, কি খুশীই সব হ'লেন খেয়ে! ধরো ওই মান্তীর মা, খেতে পায় না—স্বামী গিয়ে পর্য্যন্ত দুর্দ্দশার একশেষ। তার পাতে গরম-গরম লুচি দিয়ে আমার যেন মনে হলো, এমন আনন্দ তুমি আমায় হাজার থিয়েটার-যাত্রা দেখালেও পেতুম না! আহা, কি খুশী হলো খেয়ে! দেখে যেন চোখে জল আসে। এদের ছেড়ে যাবো—কোথায় যাবো, সেখানে গিয়ে কিভাবে থাকবো, তাই কেবল ভাবচি!

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—নতুন কাজ করতে গেলে, সাহস করতে হয় মনে, নইলে কি হয়? এতে ভাবনার কিছু নেই। আমি একটা ছোটখাটো বাড়ীর সন্ধান পেয়েছি, বায়না ক'রে ফেলি, তুমি কি বলো?

—যা তোমার মনে হয়। যদি বোঝো, তাতে সুবিধে হবে, তাই করো।

পরদিন নির্ম্মলকে কলিকাতায় গিয়া বাড়ী বায়না করানোর জন্য গদাধর পাঠাইয়া দিলেন এবং বৈশাখ মাসের শেষে এখান হইতে কলিকাতায় যাওয়ার সব ঠিকঠাক হইয়া গেল।

ভড়মশায় একদিন বলিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো?

—কি, বলুন?

—আমার এতদিনের চাকরিটা গেল?

—কেন, গেল কি-রকম?

—এখানে আড়ত রাখবেন না তো ?

—তা ঠিক বলা যায় না! কিন্তু আপনি তো কলকাতায় যাবেন।

—ঐখানে আমায় মাপ করতে হবে বাবু। কলকাতায় গিয়ে আমি থাকতে পারবো না। অভ্যেসই নেই বাবু—মাঝে-মাঝে আপনার কাজে বেলেঘাটা-আড়তে যাই—চ'লে আসতে পারলে যেন বাঁচি !

—কেন বলুন তো ভড়মশায় ?

—ওখানে বড় শব্দ দিন-রাত। আমার জন্মে অভ্যেস নেই বাবু, অত শব্দের মধ্যে থাকা। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, ওখানে থাকা কি আমাদের পোষায় ? আমার বেয়াদবি মাপ করবেন বাবু, সে আমার দ্বারা হবে না।

নির্ম্মল আসিয়া একদিন বলিল—ওহে, তাহ'লে দুখানা লরি ক'রে মালপত্র ক্রমশঃ পাঠাই কলকাতায়।

গদাধর বলিলেন—কিন্তু তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলচেন, এখানে কিছু জিনিষ থাক। এ-বাড়ীর বাস একেবারে উঠিয়ে দিচ্ছিনে তো আর! মাঝে-মাঝে আসবো-যাবো···

—সে তো রাখতেই হবে। তবে সামান্য কিছু রাখো এখানে। জিনিষপত্র এখানে থাকলে দেখবার লোকের অভাবে নষ্ট হবে বইতো নয় !

—তাই বলছিল তোমার বৌ-ঠাকরুণ। এখানেও পৈতৃক বাড়ী বজায় রাখা আমারও মত।

শুভদিন দেখিয়া সকলে কলিকাতায় রওনা হইলেন। নির্ম্মল সঙ্গে গেল। ঠিক হইল, ভড়মহাশয় আপাততঃ কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার আড়তে থাকিয়া কাজকর্ম্ম গুছাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিবেন—তবে উপস্থিত নয়। মাসখানেক পরে আড়তের কাজ অল্প একটু চালু হইলে তারপর।

তিন

লালবিহারী সা রোডে ছোট্ট দোতলা বাড়ী। চারখানা ঘর, এ-বাদে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার-ঘর আছে।

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—বাড়ী কেমন হয়েছে?

—ভালোই তো। কত টাকায় হলো?

—সাড়ে-দশ হাজার টাকা। বন্ধক ছিল—খালাস করতে আরও দু'হাজার লেগেছে।

—এত টাকা বাড়ীর পেছনে এখন খরচ না করলেই পারতে।

—কিন্তু, কলকাতায় বাড়ী···একটা সম্পত্তি হয়ে রইলো, তা ভুলে যেওনা।

—আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি, বলো? তুমি যা বোঝো, তাই ভালো।

গদাধরের আড়তের কাজ এখনও ভালো চলে নাই।

ভড়মহাশয় পুরানো লোক,—তিনি একদিন বলিলেন—এখানে কাজ দাঁড়াবে ভালো বাবু।

ভড়মহাশয়কে গদাধর বিশ্বাস করিতেন খুব বেশি, তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিতেন অনেকখানি। উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—দাঁড়াবে ব'লে আপনার মনে হয় ভড়মশায়?

—আমার কথাটা ধরেই রাখুন বাবু—চুল পাকিয়ে ফেললাম এই কাজ ক'রে। মুখপাতেই জিনিষ বোঝা যায়, মুখপাত দেখা দিয়েচে ভালো।

—আপনি বললে অনেকটা ভরসা পাই।

—আমি আপনাকে বাজে-কথা বলবো না বাবু।

কলিকাতায় আসিয়া অনঙ্গ খুব আনন্দে দিনকতক কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া কাটাইল—দক্ষিণেশ্বরে দু'দিন মন্দির দর্শন ও গঙ্গাস্নান করিল—দূর সম্পর্কের কে এক পিসতুতো ভাই ছিল এখানে, তাহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কি-একটা পাতাইয়া আসিল…বৌবাজারের দোকান হইতে আসবাব-পত্র আনাইয়া মনের মত করিয়া ঘর সাজাইল।

ছেলে দুটিকে কাছে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল; বাড়ীতে পড়ানোর জন্য মাষ্টার রাখা—এক কথায় ভালো করিয়াই এখানে সংসার পাতিয়া বসা হইল।

একদিন নির্ম্মল আসিয়া আড়তে দেখা করিল। প্রায় মাস-খানেক দেখাই হয় নাই তাহার সঙ্গে। গদাধর খুশী হইয়া বলিলেন—আরে এসো, নির্ম্মল! দেশ থেকে এলে এখন? খবর ভালো?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন, তাই এলাম একবার।

—খুব ভালো করেচো। যাও, বাড়ীতে যাও—তোমার বৌ-ঠাকরুণ আছেন, গিয়ে ততক্ষণ চা-টা খাওগে, আমি আসচি।

নির্ম্মল নীচু-গলায় বলিল—কিন্তু তোমার কাছে এসেছিলাম আর-এক কাজে। আমার কিছু টাকার বড়ো প্রয়োজন, ভাই।

—কেন, হঠাৎ টাকার কি প্রয়োজন হলো?

—বাকি খাজনার দায়ে পৈতৃক জমি বিক্রি হতে বসেচে—দেখাবো-এখন সব তোমায়।

—কত টাকা?

—শ'তিনেক।

—কবে চাই?

—আজই দাও। তোমাকে হ্যাণ্ডনোট দেবো তার বদলে।

—কিছুই দিতে হবেনা তোমায়। যখন স্থবিধে হবে, দিয়ে দিও।

নির্ম্মল যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। করিবারই কথা। সে-দিনটা গদাধরের বাড়ীতে থাকিয়া আহারাদি করিয়া, সন্ধ্যাবেলা বলিল—চলো গদাই, তোমাকে বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনি।

গদাধর বিশেষ সৌখীন-প্রকৃতির লোক নহেন। এতদিন কলিকাতায় আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও একদিনের জন্য কোনো আমোদ-প্রমোদের দিকে যান নাই—নিজের আড়তে কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। নির্ম্মলের পীড়াপীড়িতে সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা বায়োস্কোপ দেখিতে গেলেন। 'প্রতিদান' বলিয়া একটা বাংলা ছবি···গদাধরের মন্দ লাগিল্ না। অনেকদিন তিনি থিয়েটার বা বায়োস্কোপ দেখেন নাই, বাংলা ছবি এমন চমৎকার হয়ে উঠিয়াছে, তাহার সন্ধানই তিনি রাখেন না।

বায়োস্কোপ হইতে বাহির হইয়া নির্ম্মল বলিল—চা খাবে?

—তা মন্দ হয় না।

—চলো, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ী, তোমায় আলাপ করিয়ে দিই।

মিনিট-পাঁচেক-রাস্তা-দূরে একটা গলির মোড়ে বেশ বড় একখানা বাড়ীর সামনে গিয়া নির্ম্মল বলিল—দাঁড়াও, আমি আসচি।

কিছুক্ষণ পরে একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে নির্ম্মল ফিরিয়া আসিল। হাসিয়া বলিল—এই যে, আলাপ করিয়ে দিই, এঁরই নাম গদাধর বসু, বাড়ী—

গদাধর অবাক হইয়া চাহিয়া বলিলেন—আরে শচীন যে! তুমি এখানে?

—এসো ভাই, এসো।...নির্ম্মল আমাকে বললে, 'কে এসেচে ভাখো!' তুমি যে দয়া ক'রে এসেচো...আমি ভাবলুম না-জানি কে? তা তুমি! সত্যি?

—এটা কাদের বাড়ী?

—আরে, এসোই না! অনেকদিন দেখাশুনো নেই—সব কথা শুনি।

সম্পর্কে শচীন তাঁহার জ্যাঠতুতো ভাই,—অর্থাৎ বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে—আরবারে 'কুসুম-বাম্‌নীর দ'র ভাগ-বাটোয়ারার সময় ইঁহারই উদ্দেশে শ্লেষ করিয়া কথা বলিয়াছিলেন গদাধর। শচীন বখিয়া গিয়াছে, এ-কথা গ্রামের সকলেই জানিত—তবে গদাধর শুনিয়াছিলেন, আজকাল সে ভালো হইয়াছে—কলিকাতায় থাকিয়া কি চাকুরী করে।

গদাধর বলিলেন—নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার দেখাশুনো হয় নাকি?

শচীন হাসিয়া বলিল—কেন হবেনা? তুমি তো আর দেশের লোকের খোঁজ নাওনা! শুনলুম, বাড়ী করেচো কলকাতায়...

—হ্যাঁঃ সে আবার বাড়ী! কোনোরকমে ওই মাথা গোঁজবার জায়গা...

—বৌদিদিকে এনেচো নাকি?

—অনেকদিন।

—আমাদের তো আর যেতে বললে না একদিন! সন্ধানই কি রাখো!

—আমি কি ক'রে সন্ধান রাখি, বলো? নির্ম্মল নিয়ে এলো তাই তোমাকে চক্ষে দেখলুম এই এতকাল পরে। তুমি তো গ্রামছাড়া আজ তিন বছরের ওপর।

শচীনের সঙ্গে গদাধর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। বাহিরের ঘর পার হইয়া ছোট একটি হলঘর। হলঘরের চারিপাশে কামরা—সামনে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। একটা বড় ক্লক-ঘড়ি হলের একপাশে টিক্‌টিক্ করিতেছে, কাঠের টবে বড়-বড় পামগাছ। শচীন উহাদের লইয়া দোতলার সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে ডাক দিল—ও শোভা, কাদের নিয়ে এলুম, দেখ। শচীনের ডাকে একটি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল, তাহার পরনে সাদাসিদে কালোপাড় ধুতি, অগোছালো চুলের রাশ পিঠের উপরে পড়িয়াছে, মুখে-চোখে মৃদু কৌতূহল। মুখে সে কোনো কথা বলিল না। ত্রিশের বেশি বয়স কোনোমতেই নয়—খুব রোগা নয়, দোহারা গড়ন—রং খুব ফর্সা।

শচীন বলিল—বলো তো শোভারাণী, কে এসেচে?

মেয়েটি বলিল—কি ক'রে জানবো!

আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েটি কাহাকেও অভ্যর্থনাসূচক একটা কথা বলিল না বটে, তবু তাহাকে অভদ্র বলিয়া মনে হইল না গদাধরের। এমন মুখশ্রী তিনি কোথায় যেন দেখিয়াছেন! দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, বেশ চমৎকার মুখ! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলেন কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না।

সকলে উপরে উঠিলেন। বারান্দায় বেতের চেয়ার খানকতক গোল করিয়া পাতা—মাঝখানে একটা বেতের টেবিল। সেখানে শচীন তাঁহাদের বসাইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—ইনি শ্রীযুক্ত গদাধর চন্দ্র বসু, আমার জ্যাঠতুতো ভাই—আমাদের বয়স একই, দু-এক মাসের ছোট-বড়। মার্চ্চেন্ট্। গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ী।

গদাধর অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। নির্ম্মল ও শচীন এ কোথায় তাহাকে আনিল? শচীনের কোনো আত্মীয়ের বাড়ী হইবে হয়তো! মেয়েটি কে? গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়ে কি সকলের সামনে এভাবে ডাক দিলে বাহির হইয়া আসে? তিনি নিজের গ্রামে তো দেখেন নাই—তবে কলিকাতার ব্যাপারই আলাদা।

শচীন বলিল—পরিচয় করিয়ে দিই এঁর সঙ্গে—ইনি প্রখ্যাতনামা 'ষ্টার' শোভারাণী মিত্র—নাম শোনোনি?

নির্ম্মল বলিল—এইমাত্র দেখে এলে; 'প্রতিদান' ফিল্ম, সে ফিল্মের কমলা!

গদাধর এতক্ষণ পরে বুঝিলেন। সেইজন্যই তাঁহার মনে হইতেছিল, মেয়েটির মুখ বড় পরিচিত—কোথায় যেন দেখিয়াছেন! মেয়েটি 'ফিল্ম-ষ্টার' শোভারাণী মিত্র—'প্রতিদান'

উঠাইয়া পেয়ালাগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিল—আগে গদাধরের সামনে, তারপরে নির্ম্মলের ও সবশেষে শচীনের সামনে।

গদাধরকে বলিল—চিনিটা দেখুন তো? আমি দু'চামচ ক'রে দিতে বলি সব পেয়ালায়—যদি কেউ বেশি খান, আবার দেওয়া ভালো।

গদাধর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, মেয়েটির ডাগর চোখের পূর্ণ-দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর। কি সুন্দর মুখশ্রী, অপূর্ব্ব লাবণ্য-ভরা ভঙ্গি ঠোঁটের নীচের অংশে। গদাধরের সারা দেহ নিজের অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। নামজাদা অভিনেত্রী শোভারাণী মিত্র···তাঁহাকে—গদাধর বসুকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছে! বিশ্বাস করা শক্ত!

গদাধর তখনই চোখ নামাইয়া লইলেন। বেশিক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ছবিতে এইমাত্র যাহাকে দেখিয়া আসিলেন—সেই নির্য্যাতিতা মহীয়সী বধূ কমলা রক্ত-মাংসের জীবন্ত দেহ লইয়া, তাহার অপূর্ব্ব মুখশ্রী লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে···তাঁহাকেই···গদাধর বসুকে!···বলিতেছে—আপনার চায়ে কি চিনি কম হয়েচে?

এমন ঘটনা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তিনি কল্পনা করিতে পারিতেন না!

অথচ চিনি আদৌ ঠিক ছিল না। চিনির অভাবে চা তেতো বিস্বাদ। চায়ে চার চামচের কম চিনি তিনি কখনো

খান্‌না বাড়ীতে। ইহা লইয়া অনঙ্গ তাঁহাকে কত ক্ষেপাইত—'তোমার তো চা খাওয়া নয়, চিনির সরবৎ খাওয়া! চিনির রসে কাপের সঙ্গে ডিসের সঙ্গে এঁটে জড়িয়ে যাবে, তবে হবে তোমার ঠিকমত চিনি!'

কিন্তু এ তো আর অনঙ্গ নয়! এখানে সমীহ করিয়া চলিতে হইবে বৈ কি!

শচীন বলিল—তোমরা এদিকে গিয়েছিলে কোথায়?

হাসিয়া নির্ম্মল বলিল—আমরা এইমাত্তর 'প্রতিদান' দেখে ফিরলুম।

—কেমন লাগলো?

—বেশ লেগেচে—বিশেষ ক'রে এঁর পার্ট—ওঃ!

মেয়েটি গদাধরের দিকে চাহিয়া সরাসরিভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কেমন লাগলো?

গদাধর সঙ্কুচিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন ধরণের সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য ঘটা দূরের কথা—এর আগে এমন মহিলা তিনি চক্ষেও দেখেন নাই! শিক্ষিতা নিশ্চয়, কারণ, ওই ছবির মধ্যে এঁর মুখে যেসব বড়-বড় কথা আছে, যেমন সব গান ইনি গাহিয়াছেন, যেমন ইঁহার চমৎকার উচ্চারণের ভঙ্গি, কথা বলিবার কায়দা, হাত-পা নাড়ার ধরণ ইত্যাদি দেখা গিয়াছে—শিক্ষিত না হইলে অমনটি করা যায় না। গদাধর পল্লীগ্রামে বাস করেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।

তিনি বলিলেন—খুব ভালো লেগেচে। ওই যে নির্ম্মল বললে, আপনার পার্ট—ওরকম আর দেখিনি।

—কোন্ জায়গাটা আপনার সব চেয়ে ভালো লেগেচে বলুন তো? দেখি, আপনারা বাইরে থেকে আসেন, আপনাদের মনে আমাদের অভিনয়ের এফেক্টটা কেমন হয়, সেটা জানা খুব দরকার আমাদের।

শচীন অভিমানের সুরে বলিল—কেন, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? আমাদের মতের কোনো দাম···

—সেজন্যে নয়। আপনারা সর্ব্বদা দেখচেন আর এঁরা গ্রামে থাকেন, আজ এসেচেন—কাল চ'লে যাবেন। এঁদের মতের দাম অন্যরকম।

গদাধর আরও লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, না, না, আমাদের আবার মত! তবে আমার খুব ভালো লেগেচে, যখন আপনাকে—মানে, কমলাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো—আপনার সেই গানখানা গাছতলার পুকুর-পাড়ে স্বামীর ঘরের দিকে চোখ রেখে—ওঃ, সেইসময় চোখের জল রাখা যায় না! আরও বিশেষ ক'রে ওই জায়গাটা ভালো লাগে—ওইখানটাতে আপনার পরনের শাড়ী,···আপনার চোখের ভঙ্গি,···কেমন একটা অসহায় ভাব···সব মিলিয়ে মনে হয়, সত্যিই পাড়াগাঁয়ের শাশুড়ীর অত্যাচারে ঘরছাড়া হয়েচে, এমন একটি বৌকে চোখের সামনে দেখচি! বায়োস্কোপে দেখচি, মনে থাকে না। ওখানে আপনি নিজেকে নিজে একেবারে হারিয়ে ফেলেচেন!

শচীন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, ইয়ার্কির সুরে বলিল—বারে আমাদের গদাই, তোমার মধ্যে এত ছিল, তা তো জানিনে—একেবারে 'আনন্দবাজার'-এর 'ফিল্‌ম্‌-ক্রিটিক' হয়ে উঠলে যে বাবা!

মেয়েটি একমনে আগ্রহের সঙ্গে গদাধরের কথা শুনিতেছিল—শচীনের দিকে গম্ভীরমুখে চাহিয়া ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলিল—কি ও? উনি প্রাণ থেকে কথা বলচেন···আমি বুঝেচি উনি কি বলচেন। আপনার মত হাল্‌কা মেজাজের লোক কি সবাই?

মুখ ম্লান করিয়া শচীন আগেকার সুরের জের টানিয়া বলিল—বেশ, বেশ, ভালো হ'লেই ভালো। আমার কোনো কথা বলবার দরকার কি? ব'লে যাও হে···

গদাধর সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিলেন, কোনো কথা বলিলেন না।

মেয়েটি আবার গদাধরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—হ্যাঁ, বলুন, কি বলছিলেন···

গদাধর বিনীত ও লজ্জিত-হাস্যে বলিলেন—আজ্ঞে, ওই। আমাদের মত লোকের আর বেশি কি বলবার আছে, বলুন? তবে শেষ-দিকটাতে, যেখানে কমলা কাশীর ঘাটে আবার স্বামীর দেখা পেলে, ও-জায়গাটা আরও বিশেষ ক'রে ভালো লেগেচে।

—আর ওই যে কি বললেন···

—মানে, কমলার পরনের কাপড় ঠিক একেবারে পাড়া-গাঁয়ের ওই ধরণের গেরস্ত-ঘরের উপযুক্ত—বাহুল্য নেই এতটুকু!

আনন্দে ও গর্ব্বের সুরে হাত নাড়িয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—দেখুন, ওই কাপড় আমি জোর ক'রে ম্যানেজারকে ব'লে আমদানি করি ষ্টুডিওতে। আমি বলি, স্বামী তো ছেড়ে দিয়েছে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমন ধরণের পাড়াগাঁয়ের মেয়ের পরনে জম্‌কালো রঙীন্ ব্লাউশ বা শাড়ী থাকলে ছবি ঝুলে যাবে। এজন্যে আমায় দস্তুরমত ফাইট্ করতে হয়েচে, জানেন শচীনবাবু? আর দেখুন, ইনি পাড়াগাঁ থেকে আসচেন—ইনি যতটা জানেন এ-সম্বন্ধে···

সায় দিবার সুরে নির্ম্মল বলিল—তা তো বটেই!

শচীন বলিল—যাক্, ওসব নিয়ে তর্কের দরকার নেই, শোভা, একটা গান শুনিয়ে দাও ওকে।

গদাধর পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবেই বলিল—তা যদি উনি দয়া ক'রে শুনিয়ে দেন···

মেয়েটি কিন্তু এতটুকু ভদ্রতা না রাখিয়াই তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ, যখন-তখন গান করলেই কি হয়? শচীনবাবু যেন দিন-দিন কি হয়ে উঠচেন!

গদাধর নির্ব্বোধ নন, তিনি লক্ষ্য করিলেন, শচীন মেয়েটির এ-কথার উপর আর কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না, যেন একটু দমিয়ে গেল! এবার কি মনে করিয়া গদাধর যথেষ্ট সাহস দেখাইলেন। তিনি ব্যবসাদার মানুষ, পড়্‌তি-বাজারে চড়াদামের মাল বায়না করিয়া অনেকবার লাভ করিয়াছেন—তিনি জানেন, জীবনে অনেক সময় দুঃসাহসের জয় হয়। সুতরাং তিনি আগেকার

নিতান্ত বিনয়ের ভাব ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ় অনুরোধের সুরে বলিলেন—আপনি হয়তো মেজাজ ভালো হ'লে গান গাইবেন, কিন্তু আমি আর তা শুনতে পাবো না! শচীনের কথা এবারটা রাখুন দয়া ক'রে—একটা গান শুনিয়ে দিন।

পাকা ও অভিজ্ঞ ব্যবসাদার গদাধর ভুল চাল চালেন নাই। মেয়েটি আগেকার চেয়ে নরম ও সদয়-সুরে বলিল—আপনি শুনতে চান সত্যি? শুনুন তবে।

ঘরের একপাশে বড় টেবিল-হারমোনিয়ম। মেয়েটি টুলে বসিয়া ডালা খুলিয়া, পিছনদিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল—কি শুনবেন? হিন্দী? না, ফিল্মের গান?

গদাধর কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—কমলার সেই গানখানা করুন দয়া ক'রে। সেই যখন বাড়ী ছেড়ে···

মেয়েটি একমনে গানটি গাহিল। গানের মধ্যে—আকাশ, বেদনা-ভরা বীণাধ্বনি, রুদ্র, জ্যোৎস্না, পথ-চলা প্রভৃতি অনেক সুমিষ্ট-কথা ছিল এবং আরও অনেক ধোঁয়া-ধোঁয়া ধরণের শব্দ যার অর্থ পাটের আড়তদার গদাধর ঠিকমত অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তবু তিনি তন্ময় হইয়া গানটি শুনিলেন—ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? এইমাত্র ছায়াছবিতে যে নির্য্যাতিতা বধূটিকে দেখিয়া আসিলেন, সেই মেয়েটিই রক্তমাংসের দেহে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছে!

গান শেষ হইলে গদাধর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—চমৎকার! চমৎকার!

নির্ম্মল বলিল—বাস্তবিক! যাকে বলে, ফার্স্ট ক্লাশ!

শচীন কোনো কথা বলিল না।

মেয়েটি হারমোনিয়মের ডালা সশব্দে বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল, কিন্তু গান সম্বন্ধে একটি কথা বলিল না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে ভালো করিয়াই জানে, সে যাহা গাহিবে, তাহা ভালো হইবেই—এ বিষয়ে কতকগুলি সঙ্গীত-সম্বন্ধে অজ্ঞ, অর্ব্বাচীন ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করিয়া মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করিতে সে চায় না!

গদাধর হঠাৎ দেখিলেন, কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন রাত্রি হইয়া ঘরে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—তিনি এতক্ষণ্ খেয়াল করেন নাই।

এইবার যাওয়া উচিত—আর কতক্ষণ এখানে থাকিবেন? মেয়েটি কিছু মনে করিতে পারে! কিন্তু বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেই শচীন বলিল—আহা ব'সো না হে, একসঙ্গে যাবো—আমিও তো এখানে থাকবো না।

গদাধর বলিলেন—না, আমার থাকলে চলবে না, অনেক কাজ বাকি। রাত হয়ে যাচ্চে।

নির্ম্মলও বলিল—আর-একটু থাকো। আমিও যাবো।

উহাদের বসাইয়া রাখিয়া মেয়েটি পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিকে চাঁপা রংয়ের জর্জ্জেট পরিয়া, মুখে হাল্‌কা-ভাবে পাউডারের ছোপ দিয়া, উঁচু গোড়ালির জুতো-পায়ে ঘরে ঢুকিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—এবার চলুন সবাই, বেরুনো যাক্!

শচীন বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—কোথায় যাবে আবার, সেজেগুজে এলে হঠাৎ?

—সব কথা কি আপনাকে বলতে হবে?

—না, তবু জিগ্যেস্ করচি। দোষ আছে কিছু?

—ষ্টুডিওতে পার্টি আছে সাড়ে-আটটায়।

—তুমি এখন সেই টালিগঞ্জে যাবে এই রাত্রে?

—যাবো।

অগত্যা সকলে উঠিল। শচীনের মুখ দেখিয়া বেশ মনে হইল, সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এ-স্থান ত্যাগ করিতেছে। মেয়েটি আগে-আগে, আর সকলে পিছনে চলিল। বারান্দায় যাইবার বা সিঁড়ি দিয়া নামিবার পথে মেয়েটি কাহারও সহিত একটি কথা বলিল না—রাণীর মত গর্ব্বে কাঠের সিঁড়ির উপর জুতার উঁচু গোড়ালির খট্‌খট্ শব্দ করিতে-করিতে চঞ্চলা হরিণীর মত ক্ষিপ্রপদে নামিয়া গেল—কেবল অতি মৃদু সুমিষ্ট একটি সুবাস বারান্দা ও সিঁড়ির বাতাসে মিশিয়া তাহার গমনপথ নির্দ্দেশ করিল মাত্র।

গদাধর বাড়ী ফিরিয়া সে-রাত্রে হিসাবের খাতা দেখিলেন প্রায় রাত বারোটা পর্য্যন্ত। কিন্তু অনঙ্গ যখন কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন কি জানি কেন, শোভারাণী মিত্র ফিল্ম-ষ্টারের গল্পটা জমাইয়া বলিবেন ভাবিয়াছিলেন—সেটা কিছুতেই জিহ্বাগ্রে আনিতে পারিলেন না।

এই কথাটি গদাধর পর-জীবনে অনেকবার ভাবিয়াছিলেন। যে-গল্প অনঙ্গর কাছে করিবার জন্য কতক্ষণ হইতে তাঁহার

মন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল—এত-বড় মুখরোচক ও জম্‌কালো ধরণের একটা গল্প—অথচ কেন সেদিন সে-কথা স্ত্রীর কাছে বলিতে পারিলেন না ?

কি ছিল ইহার মধ্যে ?

সেদিন হয়তো কিছুই ছিলনা, কিংবা হয়তো ছিল ! গদাধর ভালো বুঝিতে পারিতেন না !

অনঙ্গ বলিল—আজ কি শোবে, না, খাতাপত্র নিয়ে ব'সে থাকবে ? রাত ক'টা, খেয়াল আছে ?

গদাধর হঠাৎ অনঙ্গর দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন-। অনঙ্গও মেয়েমানুষ—দেখিতেও মন্দ নয়—কিন্তু কি ঠকাই ঠকিয়াছেন এতদিন। সত্যিকার মেয়ে বলিতে যা বোঝায়, তা তিনি এতদিন দেখেন নাই। আজই অন্যত্র তাহা দেখিয়া আসিলেন এইমাত্র।

বলিলেন—এই যাই।

—আজ তো খেলেও না কিছু ! শরীর ভালো আছে তো ?

অনঙ্গ সুকণ্ঠী নয়। গলার স্বর আরও মোলায়েম হইলেও ক্ষতি ছিলনা। মেয়েদের কণ্ঠস্বর মিষ্ট হইলেই ভালো মানায়—কিন্তু সব জিনিসের মধ্যেই আসল আছে, আবার মেকিও আছে।

মশারি গুঁজিতে-গুঁজিতে অনঙ্গ বলিল—আজ কোথাও গিয়েছিলে নাকি ? রাত ক'রে ফিরলে যে।

—হ্যাঁ, ওই বায়োস্কোপ দেখে এলুম কিনা !

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—তা যাবে বৈকি। আমায় নিয়ে গেলে না তো! কি দেখলে?

—একটা বাংলা ছবি···সে আর-একদিন দেখো।

অনঙ্গ আবদারের সুরে বলিল—কি ছবি, বলো না? বলো না গো গল্পটা!

সেই পুরোণো অনঙ্গ। বহুদিনের সুপরিচিত সেই আবদারের সুর। কতবার কত গল্প এই স্ত্রীর সঙ্গে···রাত একটা-দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকা গল্প করিতে-করিতে! কিন্তু গদাধর বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলেন, আজ অনঙ্গর সঙ্গে গল্পগুজব করিবার উৎসাহ যেন তিনি নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছেন না!

খাতাপত্র মুড়িয়া ঈষৎ নীরস-কণ্ঠে গদাধর বলিলেন—কি এমন গল্প! বাজে!

—হোক বাজে,—কি দেখলে···বলো না লক্ষ্মীটি।

—বড় খাটুনি গিয়েচে আজ, কথা বলতে পারচি নে।

অনঙ্গ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—তা পারবে কেন? খাতাপত্র ঘাঁটবার সময় খাটুনি হয় না।···লক্ষ্মীটি, বলো না, কি দেখলে?

—কাল সকালে শুনলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না! সত্যি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

অনঙ্গ রাগ করিল বটে, সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মিতও হইল। স্বামীর এমন ব্যবহার যে ঠিক নূতন, তাহা নহে। ঝগড়াও কতবার হইয়া গিয়াছে দু-জনের মধ্যে—কিন্তু সে ঝগড়ার মধ্যে সত্যিকার ঔদাসীন্য বা তিক্ততা ছিল না। আজ গদাধর ঝগড়ার কথা কিছু বলিতেছেন

না—খুব সাধারণ কথাই! অথচ তাহার নারী-চিত্ত যেন বুঝিল, ওই সামান্য সাধারণ অতি-তুচ্ছ প্রত্যাখ্যানের পিছনে অনেকখানি ঔদাসীন্য এবং তিক্ততা বিদ্যমান।

অনঙ্গ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

গদাধর কিন্তু শুইয়া-শুইয়া,—ফিল্ম-অভিনেত্রী শোভারাণীর ভাবনা ভাবিতেছিলেন, এ-কথা বলিলে তাঁহার উপর ঘোর অবিচার করা হইবে! সত্যই তিনি এক-আধবার ছাড়া তাহার কথা ভাবেন নাই। মেয়েদের কথা বেশিক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার মত মন গদাধরের নয়! তিনি ভাবিতেছিলেন অন্য কথা।

তিনি ভাবিতেছিলেন—জীবনটা তাঁহার বৃথায় গেল! মেকি লইয়া কাটাইলেন, আসল নারী কি বস্তু, তাহা কোনোদিন চিনিলেন না। আর একটি ছবি অন্ধকারে আধ-ঘুমের মধ্যেও বার-বার তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল···

নির্য্যাতিতা সুন্দরী বধূ কমলা শ্বশুরবাড়ী হইতে বিতাড়িতা হইয়া থরথর-কম্পিত দেহে পুকুর-পাড়ে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে স্বামীর ঘরের জানালার দিকে চাহিয়া আছে।···

চার

দিন-দুই পরে গদাধরকে দেশের আড়তের কাজে যাইতে হইবে, ভড়মশায়ও সঙ্গে যাইবেন। অনঙ্গ স্বামীকে বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। গদাধর বলিলেন—চলো, ভালো কথাই তো। ছেলেরাও যাবে—গিয়ে স্কুল কামাই হবে, উপায় নেই। তোমায় কিন্তু ছেলেদের নিয়ে একলা থাকতে হবে ক'দিন। পারবে তো?

—কেন, তুমি কোথায় থাকবে?

—আমি যাচ্ছি মোকামে পাটের সন্ধানে। নারাণপুর, আশুগঞ্জ, ঝিকরগাছা—এসব জায়গা ঘুরতে হবে। পাঁচশো গাঁট সাদা পাট অর্ডার দিয়েছে ডগলাস জুট মিল। এদিকে মাল নেই বাজারে—যা আছে, দরে পোষাচ্ছে না,—আমি দেখিগে যাই এখন মোকামে-মোকামে ঘুরে। মাথায় এখন আগুন জ্বলচে, বাড়ী ব'সে থাকবার সময় আছে?

—বাড়ীতে মোটে আসবে না?

—সেই মঙ্গলবারের দিকে যদি আসা ঘটে—তার আগে নয়।

অনঙ্গ যাইতে চাহিল না। শুধু ছেলেদের লইয়া একা সে দেশের বাড়ীতে গিয়া কি করিবে? স্বামী থাকিলে ভালো লাগিত। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা তাহার অভ্যাস নাই—বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে নাই—একা থাকিতে অনঙ্গর মন হু-হু করে। ছেলেদের লইয়া মনের শূন্যতা পূর্ণ হইতে চায় না।

ভড়মশায়কে লইয়া গদাধর চলিয়া গেলেন। বিভিন্ন মোকামে ঘুরিয়া সমস্ত পাটের জোগাড় করিতে সারাদিন লাগিয়া গেল। ফিরিবার পথে একবার গ্রামের বাড়ীতে গেলেন। ব্যবসায়-সংক্রান্ত কিছু খাতাপত্র এখানে পূবের ঘরের আলমারীতে ছিল। ক-মাস দেশ-ছাড়া—ইহার মধ্যেই বাড়ীর উঠানে চিড়চিড়ে ও আমরুল গাছের জঙ্গল বাঁধিয়া গিয়াছে, ছাদের কার্নিসে বনমূলার চারা দেখা দিয়াছে, ঘরের মধ্যে চামচিকার দল বাসা বাঁধিয়াছে। গ্রামের একটি বোষ্টমের মেয়েকে মাঝে-মাঝে ঘড়-বাড়ী দেখিতে ও ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখিতে বলিয়াছিলেন—প্রতি মাসে দুটি করিয়া টাকা এজন্য সে পাইবে, এ-ব্যবস্থা ছিল—অথচ দেখা যাইতেছে সে কিছুই করে নাই।

ভড়মশায় বলিলেন—সে বিন্দি বোষ্টুমি তো একবারও ইদিকে আসেনি ব'লে মনে হচ্চে বাবু, তাকে একবার ডেকে পাঠাই। এই ও-মাসেও তার টাকা মণিঅর্ডার ক'রে পাঠানো হয়েছে! ধর্ম্ম আর নেই দেখচি কলিকালে! পয়সা নিবি অথচ কাজ করবি নে!

সন্ধান লইয়া জানা গেল, বিন্দি বোষ্টুমি আজ ক-দিন হইল ভিন্‌-গাঁয়ে তাহার মেয়ের বাড়ী গিয়েছে। পাশের বাড়ীর সিধু ভট্টাচার্য্যির মেয়ে হৈম আসিয়া বলিল—মা ব'লে পাঠালেন, আপনি কি এখন চা খাবেন কাকা?

—এই যে হৈম মা, ভালো আছো? তোমাদের বাড়ীর সব ভালো? বাবা কোথায়?

—হ্যাঁ, সব একরকম ভালো। বাবা বাড়ী নেই। কাকীমাকে আনলেন না কেন ?

—এ তো মা, আড়তের কাজে একদিনের জন্যে আসা। আজই এখুনি চ'লে যাবো।

—তা হবে না। মা বলেচে, আপনি আর ভড়-জ্যাঠা এবেলা আমাদের বাড়ী না খেয়ে যেতে পাবেন না। মা ভাত চড়িয়েচে। আমায় ব'লে দিলে—তোর কাকা চা খাবে কিনা জিগ্যেস ক'রে আয়।

—তা যাও মা, নিয়ে এসোগে।

বৈকাল তিনটার ট্রেনে কলিকাতা যাওয়ার কথা—দুপুরে সিধু ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দু'জনে খাইতে গেলেন। হৈমর মা হাসিমুখে বলিল—কি ঠাকুরপো, এখন সহুরে হয়ে প'ড়ে আমাদের ভুলে গেলে নাকি ? বাড়ীটা যে জঙ্গল হয়ে গেল—ওর একটা ব্যবস্থা করো! অনঙ্গকে নিয়ে এলে না কেন ?

—আনবো কি বৌদি, একবেলার জন্যে আসা! তাও এখানে আসবো ব'লে আসিনি, ঝিকরগাছায় এসেছিলাম আড়তের কাজে। সে আসতে চেয়েছিল।

—এবার একদিন নিয়ে এসো ঠাকুরপো। কতদিন দেখিনি, দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

—তার চেয়ে আপনি কেন চলুন না বৌদি, সহর ঘুরে আসবেন, দেখা-শোনাও হবে ?

—আমাদের সে ভাগ্যি যদি হবে, তবে হাঁড়ি ঠেলবে কে দু'বেলা ?

ও-কথা বাদ দ্যাও তুমি—যেমন অদেষ্ট ক'রে এসেছিলাম, তেমনি তো হবে। তবে একবার কালীঘাটে গিয়ে মা'কে দর্শন করার ইচ্ছে আছে। বোশেখ মাসের দিকে, দেখি কতদূর কি হয়!

—আমায় বলবেন, আমি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো, আমার ওখানে গিয়ে পায়ের ধুলো দেবেন।

বৈকালের ট্রেনে দুজনে কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামীকে দেখিয়া অনঙ্গ বড় খুশী হইল, কাছে বসিয়া চা ও খাবার খাওয়াইতে-খাওয়াইতে বলিল—উঃ, তুমি আসো না—কি কষ্ট গিয়েছে যে! গ্রামে হয়, তবুও এক কথা। এ ধরো, নিজের বাড়ী হ'লেও বিদেশ—এখানে মন ছট্‌ফট্‌ করে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমায় একদিন শচীন ঠাকুরপো খুঁজতে এসেছিল—কি একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েচে।

—কই, কি চিঠি, দেখি।

অনঙ্গ একখানা খামের চিঠি আনিয়া স্বামীর হাতে দিল। গদাধর চা খাইতে-খাইতে খাম খুলিয়া পড়িলেন। লেখা আছে—তোমার দেখা পেলাম না এসে। শুনলাম নাকি আড়তের কাজে বার হয়েচো। দেশ থেকে বাবা চিঠি লিখেছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ—একবার দেশে যেতে হবে। একটা কথা, শোভারাণী তোমার কথা সেদিন জিগ্যেস করছিল—সময় পেলে একদিন এসো না? আমার ওখানে এসো, আমি নিয়ে যাবো! নির্ম্মল এখনও কোন্নগর থেকে ফেরেনি। সে একটা গুরুতর কাজ ক'রে গিয়েচে, সেজন্যে শোভারাণীর সঙ্গে

একবার তোমার দেখা করা জরুরী দরকার। এলে সব কথা বলবো। সেইজন্যেই শোভা তোমার খোঁজ করেচে।

চিঠি পড়িয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন। শচীন কখনো তাঁহার বাড়ী আসে না, আসার রেওয়াজ নাই। সে আসিয়া এমন একখানি জরুরী চিঠি দিয়া গেল! নির্ম্মল কি করিয়াছে? শোভারাণী মস্ত-বড় অভিনেত্রী—তাহার সঙ্গে নির্ম্মলের কি সম্বন্ধ? তাঁহাকেই-বা তাহার নিজের দরকার—ব্যাপার কি?

স্বামীর মুখ দেখিয়া অনঙ্গ কৌতূহলের সহিত বলিল—কি চিঠি গা?

—য়্যাঁ, চিঠি! হ্যাঁ, ও একটা…

—কোনো খারাপ খবর নয় তো?

—নাঃ। এ অন্য চিঠি।…আচ্ছা, আমি চ'লে গেলে নির্ম্মল এখানে এসেছিল আর?

—একদিন এসেছিল বটে। কেন বলো তো? তার কিছু হয়েচে নাকি?

—না, সে-সব নয়। সে বাড়ী যায়নি কিনা…

—সুধাদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—না, আমার সময় কোথায়? কখন যাই ও-পাড়ায় সুধাদের বাড়ী?

—খেলে কোথায়?

—সিধুদা'দের বাড়ী। হৈম এসে ডেকে নিয়ে গেল।

গদাধরের কিন্তু এসব কথা ভালো লাগিতেছিল না। কি এমন

ঘটিল, যাহার জন্য শোভারাণী তাঁহার খোঁজ করিয়াছেন! নির্ম্মল গ্রামে ফিরে নাই, অথচ তিন দিনের মধ্যেই তাহার ফিরিবার কথা।

শোভারাণীই বা তাঁহার খোঁজ করিলেন কেন? তাঁহার সহিত এসব ব্যাপারের সম্পর্ক কি?

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—ক'টা বাজলো দেখ তো?

—এই তো দেখে এলাম সাতটা বাজে! কেন, এখন আবার বেরুবে নাকি?

—এক জায়গায় যেতে হবে এখুনি। আড়তের কাজ—ফিরতে দেরি হতে পারে।

আড়তের কাজ শুনিয়া অনঙ্গ আপত্তি করিল না—নহিলে ক্লান্ত স্বামীকে সে কিছুতেই এখনি আবার বাহিরে যাইতে দিত না।

গদাধর প্রথমে শচীনের বাসায় আসিয়া শুনিলেন, সে বাহির হইয়া গিয়াছে, কখন আসিবে, ঠিক নাই। গদাধর ঘড়ি দেখিলেন, আটটা বাজে। একা এত রাত্রে শোভারাণীর বাড়ী যাওয়া কি উচিত হইবে? অথচ নির্ম্মল কি এমন গুরুতর কাজ করিয়াছে, তাহা না জানিলেও তো তাঁহার স্বস্তি নাই।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর একাই শোভারাণীর বাড়ী যাইবেন স্থির করিলেন। বাড়ীর নম্বর তিনি সেদিন দেখিয়াছেন,—নিশ্চয় বাহির করিতে কষ্ট হইবে না!

বাড়ীর যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে ভীষণ ঢিপ্-ঢিপ্ করিতে সুরু করিল, জিভ্ যেন শুকাইয়া আসিতেছে, কান দিয়া ঝাল বাহির হইতেছে—বুকের ভিতরে তোলপাড়

কিছুতে শান্ত হয় না! এমন তো কখনো হয় নাই। গদাধর খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা ভীত হইয়া উঠিলেন।

অনেকখানি আসিয়া ঠিক করিলেন, থাক্ আজ, সেখানে শচীনের সঙ্গে যাওয়াই ভালো। মহিলাদের সঙ্গে তেমন করিয়া আলাপ করা তাঁহার অভ্যাস নাই, কখনো করেন নাই—বড় বাধো-বাধো ঠেকে। তাছাড়া তিনি যদি কিছু মনে করেন?

কিন্তু গদাধর ফিরিতে পারিলেন না। উত্তেজনা ও ভয়ের পিছনে মনের গভীর গহনে একটা আনন্দের ও কৌতূহলের নেশা—সেটা চাপিয়া রাখা অসম্ভব।

বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া গদাধর খানিকক্ষণ বন্ধ-দরজার সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। কড়া নাড়িবেন কি নাড়িবেন না? চলিয়া যাওয়াই বোধহয় ভালো! একবার চলিয়া যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং মরিয়া হইয়া সজোরে কড়া নাড়া দিলেন। প্রথম দু'একবার নাড়াতে কেহ সাড়া দিল না। মিনিট তিন-চার পরে ছোকরা চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল—কাকে চান আপনি?

গদাধর বলিলেন—মিস্ শোভারাণী মিত্র আছেন?

তাঁহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

চাকর বলিল—হ্যাঁ, আছেন। আপনার কি দরকার?

—আমার বিশেষ দরকার আছে, একবার দেখা করবো।

—কি নাম বলবো?

—বলো, গদাধরবাবু,—শচীনের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন।

একটু পরে চাকর আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল—চলুন ওপরে।

উপরের হল-ঘর পার হইয়া সেদিনের সেই কামরাতে চাকর তাঁহাকে লইয়া গেল। গদাধর গিয়া দেখিলেন, শোভা একটা ঈজিচেয়ারে শুইয়া কি বই পড়িতেছে—পাশে টিপয়ের উপর পেয়ালা ও ডিস—বোধহয় এইমাত্র চা-পান শেষ করিয়াছে।

গদাধর ঢুকিতেই শোভা ঈজিচেয়ার হইতে আধ-ওঠা অবস্থায় বলিল—আসুন গদাধরবাবু, আসুন।

—আজ্ঞে, নমস্কার।

—নমস্কার! বসুন।

গদাধর বসিলেন। শোভারাণী পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই। আন্দাজ পাঁচ-মিনিট পরে শোভা হাতের বইখানি পাশের টিপয়ে রাখিতে গিয়া সেখানে চায়ের পেয়ালা দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—আঃ, এগুলো ফেলে রেখেচে এখনো! ওরে, ও গোবিন্দ!

গদাধর আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—এই এলাম। শচীন একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছিল আমার বাড়ীতে। আপনার সঙ্গে দেখা করা বড় দরকার নাকি, নির্ম্মলের জন্যে—তাই।

এতক্ষণ পরে শোভার মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। সে বলিল —নির্ম্মলবাবুর কথা ছেড়ে দিন। আপনি কি নির্ম্মলবাবুর বিশেষ বন্ধু?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি ওর বাল্যবন্ধু।

—নির্ম্মলবাবুর অবস্থা ভালো নয়, বোধহয়?

—সেইরকমই বটে। কিন্তু সে কি করেচে, বলুন তো? আমি কিছু বুঝতে পারচি নে।

—সে-কথা আপনাকে ব'লে শুধু মনে কষ্ট দেওয়া! ষ্টুডিওর একটা চেক্ ভাঙাতে দিয়েছিলাম—দুশো টাকার চেক্—তারপর থেকে আর তাঁর দেখা নেই! আপনি যেদিন এখানে এসেছিলেন, তার পরের দিন। শুনচি, কোন্নগরে আছে—চিঠি লিখেও শচীনবাবু উত্তর পায় না। অথচ আমার এদিকে টাকার দরকার!

গদাধর বুঝিলেন, শচীন যাহা গুরুতর ব্যাপার বলিতেছে—তাহা এমন গুরুতর নয়! নির্ম্মল মাঝে-মাঝে এমন করিয়া থাকে। তাহার চেক্ ভাঙাইতে গিয়াও সে এমন করিয়াছে। তবে তিনি বাল্যবন্ধু—তাঁহার বেলা যাহা করা চলে, সব ক্ষেত্রে কি তাহা করা উচিত? নির্ম্মলটার বুদ্ধিশুদ্ধি যে কবে হইবে!

তিনি বলিলেন—তাইতো, ভারি অন্যায় দেখচি তার। আমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে আমি আচ্ছা ক'রে ধমকে দেবো।

—হ্যাঁ, দেবেন তো—দেওয়াই উচিত।

মৃদু উদাসীন কণ্ঠস্বর শোভার। রাগ বা ঝাঁজ তো নাই-ই—এমন কি, এতটুকু উদ্বেগের রেশ পর্য্যন্ত নাই! গদাধর মুগ্ধ হইলেন। এক্ষেত্রে তাঁহাকে সামনে পাইয়া চেঁচামেচি করা এবং টাকার একটা কিনারা হওয়া সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রদর্শন, পরামর্শ আহ্বান করা ইত্যাদিই স্বাভাবিক। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে ইহা অপেক্ষা অনেক তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া ভীষণ চীৎকার ও

রাগারাগি করিতে দেখিয়া আসিতেছেন তিনি আজীবন। কিন্তু দুশো টাকার ক্ষতি সহ্য করিয়াও এমন নিরুদ্বেগ শান্ত ভাব তিনি কখনো দেখেন নাই,—না মেয়েদের মধ্যে, না পুরুষদের মধ্যে।

গদাধর একটি সাহসের কাজ করিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন—একটা কথা বলি—কিছু মনে করবেন না।

শোভা বলিল—কি, বলুন ?

—আপনার টাকার দরকার বলছিলেন,···ও-টাকাটা আমি কাল সকালেই আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। নির্ম্মলের কাছ থেকে চেকের টাকা আমি আদায় ক'রে নেবো।

—আপনি ? না, না, আপনি কেন দেবেন ?

—আজ্ঞে, তা হোক। আপনি যদি কিছু মনে না করেন···

শোভা আর কোনো তর্ক না করিয়া বেশ নির্ব্বিকার-কণ্ঠে বলিল—বেশ, দেবেন।

গদাধর কৃতার্থ হইয়া গেলেন যেন! বলিলেন—কাল সকালে কি থাকবেন ?

—আমি এগারোটা পর্য্যন্ত আছি।

—তাহলে আমি নিজেই ওটা নিয়ে আসবো।

—আপনি আবার কষ্ট ক'রে আসবেন কেন—কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন না হয়।

গদাধর দেখিলেন, এ-জায়গায় অন্য কাহাকেও চেক্ দিয়া পাঠানো চলিবে না—নতুবা ভড়মশায়কে পাঠাইয়া দিলে চলিত। ভড়মশায় বা অন্য কেহ মুখে কিছু না বলিলেও, নানারকম সন্দেহ করিতে পারে

—কথাটা পাঁচ-কান হওয়াও বিচিত্র নয় সে-অবস্থায়। সুতরাং তিনি বলিলেন—তাতে কি, কষ্ট করবার কি আছে এর মধ্যে! আমি নিজেই আসবো-এখন!

—কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে, লালবিহারী সা রোড, মাণিকতলা।

—নির্ম্মলবাবুকে চিনলেন কি ক'রে?

—আমার গ্রামের লোক···একগাঁয়ে বাড়ী।

গদাধরের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, শোভারাণীর সঙ্গে নির্ম্মলের কিভাবে পরিচয় হইল জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ আবার দু'জনেই চুপ। গদাধর অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন, এবার বোধহয় যাওয়া ভালো—বেশিক্ষণ থাকা হয়তো বেয়াদপি হইবে। কিন্তু হঠাৎ ওঠেনই-বা কি বলিয়া!

শোভাই হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চা খাবেন?

গদাধর জানাইলেন, এখন তিনি চায়ের জন্য কষ্ট দিতে রাজী নন্—এইমাত্র খাইয়া আসিলেন। শোভারাণী আবার চুপ করিল।

কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া গদাধর বলিলেন—তাহলে আমি এবার যাই,—রাত হয়ে গেল।

শোভা বলিল—আচ্ছা,—আসুন তবে।

গদাধর উঠিলেন, শোভা এমন একটি ব্যাপার করিল, তাহার মত গর্ব্বিতা মেয়ের নিকট গদাধর যাহা প্রত্যাশা করেন নাই—শোভা ঈজিচেয়ার হইতে উঠিয়া সিঁড়ির মুখ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দিতে

আসিল। গদাধর সমস্ত দেহে এক অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ অনুভব করিলেন। নেশার মত সেটা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল সারা পথ! গদাধরের পক্ষে এ অনুভূতি এত নূতন যে, তিনি নিজের এই পরিবর্ত্তনে কেমন ভীত হইয়া পড়িলেন!

স্বামীকে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়া অনঙ্গ বলিল—বাপরে! এত দেরি করবে তা তো ব'লে গেলে না—আমি ব'সে-ব'সে ভাবচি।

—ভাবার কি দরকার আছে? ছেলেমানুষ তো নই যে, পথ হারিয়ে যাবো!

হঠাৎ সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি যেন ধাক্কা খাইয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধারণ মানুষের মতই দৈনন্দিন একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে গদাধর খাইতে বসিলেন।

পরদিন সকালে আটটার পরে গদাধর শোভারাণীর বাড়ী গিয়া কড়া নাড়িলেন। ছোকরা চাকরটি দরজা খুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং উপরে লইয়া গিয়া বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসাইয়া বলিল—মাইজি নাইবার ঘরে—আপনি বসুন।

একটু পরে ভিজে এলো-চুলের রাশি পিঠে ফেলিয়া সদ্যস্নাতা শোভা সিম্‌লের সাদা শাড়ী পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এই যে, এসেচেন! নমস্কার! খুব সকালেই এসে পড়েচেন। বসুন, আমি আসচি।

শোভা পাশের ঘরে ঢুকিয়া দুখানা মাসিকপত্র, একখানা লেটার-প্যাড্ ও একটা ফাউণ্টেন পেন লইয়া ঈজিচেয়ারটিতে আসিয়া বসিল

এবং চেয়ারের চওড়া হাতলের উপর সেগুলি রাখিয়া গদাধরের দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর ?

তাহার মুখও অন্যান্য দিনের মত উদাসীন অপ্রসন্ন নয়। বেশ প্রফুল্ল। এমন কি, ঈষৎ মৃদু হাসিও যেন কখনো অধরপ্রান্তে আসিতেছে, কখনও মিলাইয়া যাইতেছে !

গদাধর পকেট হইতে চেক্-বই বাহির করিতে-করিতে বলিলেন—সেই চেক্‌খানা…

শোভা হাসিমুখে বলিল—বসুন, চা খান, আমি এখনও চা খাইনি। স্নান না ক'রে কিছু খাই না। আপনার তাড়া নেই তো ?

—আজ্ঞে না, তাড়া নেই। চা কিন্তু একবার খেয়ে—

—সেটা উচিত হয়নি। এখানে যখন সকালে আসচেন। কোনো আপত্তি নেই তো ?

গদাধর তটস্থ হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, আপত্তি কি ?

শোভা বলিল—ওরে, নিয়ে আয়, ও লালচাঁদ !

গদাধর দেখিলেন, এ অন্য-একজন চাকর। শোভারাণীর অবস্থা তাহা হইলে বেশ ভালো। তিন জন চাকর আছে, ঝিও একটা ঘুরিতেছে—ঠাকুর নিশ্চয়ই আছে। 'স্টার'-অভিনেত্রী শোভারাণী নিশ্চয় নিজের হাতে রান্না করেন না !

লালচাঁদ ট্রেতে দু-পেয়ালা চা, আর দু-খানা প্লেটে ডিমভাজা, টোস্ট্ ও দুটি করিয়া কলা লইয়া দুটি টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শোভা বলিল—নুন দেয়নি দেখচি। আপনাকেও দেয়নি ? আঃ, এদের নিয়ে—ও লালচাঁদ !

—আপনি তো অনেক বেলায় চা খান! এখন ন'টা বাজে।

—আমি? হ্যাঁ, তাই হয়। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়, প্রায় সাড়ে-সাতটা—এক-একদিন তার বেশিও হয়। ষ্টুডিওতে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাজ হচ্ছে আজকাল—রাত এগারোটা হয় এক-একদিন ফিরতে।

গদাধর ষ্টুডিও কি ব্যাপার ভালো জানিতেন না, কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, সেখানে কি হয়? ছবি তৈরী হয় বুঝি?

শোভা বিস্ময়ের সহিত বলিল—আপনি জানেন না? দেখেননি কখনো? টালিগঞ্জের ওদিকে কখনো—ও!···

—আজ্ঞে, আমরা হলাম গিয়ে পল্লীগ্রামের লোক, আড়ত-দারি ব্যবসা নিয়েই দিন কেটে যায়। সত্যি কথা বলতে, কখনই-বা সময় পাবো, আর কখনই-বা সেই টালিগঞ্জে গিয়ে ষ্টুডিও—

হাসিয়া শোভা বলিল—তা তো বটেই। বেশ, চলুন না একদিন—আমার গাড়ীতে যাবেন আমার সঙ্গে, ষ্টুডিও দেখে আসবেন।

গদাধর কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, আমার গাড়ী! মানে? তাহা হইলে মোটরও আছে! গদাধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহা নয়, এ মেয়েটির অবস্থা হয়তো তাঁহার অপেক্ষাও ভালো। কলিকাতার লোককে বাহিরে দেখিয়া চেনা যায় না। তিনি এতদিন পাটের ব্যবসা করিয়া পাটের ফেঁসো খাইয়া মরিলেন, মোটর গাড়ীর মুখ দেখিতে পাইলেন না! অথচ মেয়েটি এই অল্পবয়সে—দেখ একবার!

বিনীতভাবে তিনি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, তা গেলেই হয়, আপনি যদি—তা বরং একদিন···

—আর এক পেয়ালা চা ?

—আজ্ঞে না, আর···

—আমার কিন্তু দু'পেয়ালার কমে হয় না। সারাদিনের মধ্যে দশ-বারো বার হয়ে যায়—ষ্টুডিওতে তো খালি চা আর খালি চা—নাহলে পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি—যেমন পরিশ্রম, তেমনি গরম···

চাকর এক পেয়ালা চা আনিয়া শোভার পাশের টিপয়ে রাখিয়া তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিল। শোভা তাহাকে বলিল—না, এখন যা···আপনি সত্যিই নেবেন না আর-এক—

—আজ্ঞে না, আমার শরীর খারাপ হয় বেশি চা খেলে। তেমন অভ্যেস নেই তো !

—আপনার শরীর দেখে মনে হয়, বোধহয় ম্যালেরিয়া হয় মাঝে-মাঝে ?

—আগে হয়ে গিয়েচে, এখন কলকাতায় আর হয় না।

—বাড়ী করেচেন তো এখানে? বেশ, এখানেই থাকুন। শচীনবাবু আপনার ভাই হয় সম্পর্কে ? ও জানেন, আমাদের ষ্টুডিওতে কাজ করে। আমার সঙ্গে আজ দেখা হবে-এখন—বলবো আপনার কথা।

—শচীন ষ্টুডিওতে কাজ করে, তা তো জানতুম না।

—জানতেন না নাকি ? বেশ। সেই নিয়েই তো আমার সঙ্গে জানাশোনা হলো—এখানে আসে-যায় মাঝে মাঝে। আমার গানগুলো একবার সুর দিয়ে ওর সঙ্গে সেট্ ক'রে নিই।

শচীন বাজাইতে পারে, গদাধর আগেই জানিতেন—সখের যাত্রার দলে বাঁশি বাজাইয়া বেড়াইয়া লেখাপড়া শিখিল না, কখনো বিষয়-আশয় দেখাশুনা করিল না। সে যে কলিকাতায় আসিয়া এত-বড় 'বাজিয়ে' হইয়া উঠিয়াছে, ফিল্‌ম্ তোলার ষ্টুডিওতে চাকরি করে—এত খবর তিনি রাখিতেন না! শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন।

চা পান শেষ হইলে গদাধর দু'এক কথার পর পুনরায় চেক্-বই বাহির করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—তাহ'লে ক্রস্ চেক্ দেবো কি? আপনার পুরো নামটা—

—ও! চেক্‌খানা? ও আর আপনাকে দিতে হবে না।

গদাধর এমন বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহার মনে হইল, তিনি কথার অর্থ ঠিক বুঝিতেছেন না। শোভার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন—না, মানে আমি বলচি, আপনার নামটা চেকে লিখে ক্রস্ ক'রে দেবো কি না?

শোভা এবার বেশ ভালো ভাবেই হাসিল। মৃদুহাসি নয়, সত্যি-কার আমোদ আর কৌতুকের হাসি। গদাধর মুগ্ধ হইয়া গেলেন সেই অতি অল্প দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যেই! হাসিলে যে সব মেয়ে যথার্থ সুন্দরী, তাহাদের চোখে-মুখে কি সৌন্দর্য্য ও মোহ ফুটিয়া উঠে—গদাধর পাটের বস্তা ওজন করিয়া মোকামে মোকামে ঘুরিয়া কাল কাটাইয়াছেন এতদিন—কখনও দেখেন নাই!

হাসিতে-হাসিতে শোভা বলিল—আপনি ভারি মজার লোক—বেশ লাগে আপনাকে—শুনতে পেলেন না, কি বলচি? ও চেক্ দিতে হবে না আপনাকে।

—কেন বলুন তো ?

—আপনার বন্ধু নিয়ে গেল টাকা আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে··· আপনি কেন দণ্ড দেবেন ? গেল, যাক্‌গে, আমারই গেল।

—না না, তা কখনও হয় ? আমার তো বন্ধু, ও অভাবী লোক, ঠিক যে ঠকিয়ে নিয়েছে, তা নয়। ও টাকা আমি আদায় করবো। নিন্ আমার কাছ থেকে—আপনার পুরো নামটা—

শোভার মুখশ্রী ও চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সদয় হইয়া আসিয়াছে—সে গর্ব্বিত ও উদাসভাব আর ওর মুখে-চোখে নাই। দুই হাত অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া সে বলিল—না, আমি বলচি, কেন দুশো টাকা মিথ্যে দণ্ড দেবেন ? যদি আদায় করতে পারি, আমিই করবো। আমি ফিল্‌মে কাজ করি। অনেক লোকের সঙ্গে মিশি রোজ—মানুষ চিনি। আপনার বন্ধুটি আপনার মত ভালোমানুষ লোককে কখনো টাকা শোধ করবে না—কিন্তু আমার কাছে করবে। চেক্-বইটা পকেটে ফেলুন।

গদাধর চুপ করিয়া রহিলেন, আর কিছু বলা ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে না হয়তো! জোর করিয়া কাহাকেও টাকা গছাইতে আসেন নাই তিনি।

শোভা বলিল—কিছু মনে করেন নি তো ?

—আজ্ঞে না, এর মধ্যে মনে করার কি আছে ? তবে···

—শচীনবাবুকে কিছু বলবার থাকে তো বলুন—ষ্টুডিওতে দেখা হবে।

—আমি এখানে এসেছিলুম এই কথাই বলবেন, তাছাড়া আর কি। তাহ'লে আমি উঠি আজ। নমস্কার।

গদাধর সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়, এবারও শোভা সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় গদাধর দৈবাৎ একবার উপরের দিকে চাহিতেই শোভার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। গদাধর ভদ্রলোক, লজ্জিত হইলেন। অমনভাবে চাওয়া উচিত হয় নাই। কি উনি মনে করিলেন?

মেয়েটি অদ্ভুত! কাল বলিয়া দিল টাকা আনিতে, অথচ আজ কিছুতেই লইতে চাহিল না! টাকা এভাবে কে ফিরাইয়া দেয় আজকালকার বাজারে? বিশেষ তিনি যখন যাচিয়াই দিতে গিয়াছিলেন!

সেদিন সারাদিন আড়তের কাজকর্ম্মের ফাঁকে মেয়েটির মুখ কিছুতেই মন হইতে দূর করতে পারিলেন না। সেই সদ্যস্নাতা মূর্ত্তি, হাসি-হাসি সুন্দর মুখ, দয়ার্দ্র ডাগর চোখ দুটি! ছবির সেই বধূ—কমলা।

বৈকালে চা ও লুচি খাইতে দিয়া অনঙ্গ বলিল—হ্যাঁ গো, নির্ম্মল-ঠাকুরপো কোথায়?

—কেন? কি হয়েচে বলো তো?

—সুধা আমায় একখানা চিঠি লিখেচে—তাতে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েচে, লিখচে! নির্ম্মল-ঠাকুরপোর কোনো পাত্তা নেই—এতদিন দেশ থেকে এসেচে…

দম্পতি

—কি ক'রে বলবো, বলো ? ওসব কথার কি উত্তর দেবো ? সে তো আমায় বলে যায়নি।

স্বামীর বিরক্তির সুর অনঙ্গ লক্ষ্য করিল। আজকাল যেন কি হইয়াছে, কথা বলিলে সব সময় রাগ-রাগ ভাব ! কলিকাতায় আসিয়া এই কিছুদিন হইল এরূপ হইয়াছে স্বামীর ! আগে সে কখনো এমন দেখে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নরম-সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল—আজ রাত্রে কি খাবে ?

গদাধর স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন। এসব জাতীয় মেয়েদের মুখে অন্য কোনো কথা নাই—কেবল খাওয়া আর খাওয়া ! কি কথাই-বা জানা আছে যে বলিবে ? উত্তর দিলেন—সে হলো রাতের কথা—যা হয় হবে-এখন, তা নিয়ে এখন মাথাব্যথা কিসের ?

অনঙ্গ এবার রাগ করিল ; বলিল—সব-তাতেই অমন খিঁচিয়ে ওঠো কেন আজকাল, বলো তো ? মিষ্টি কথায় উত্তর দিতে ভুলে গেলে নাকি ? এমন তো ছিলে না দেশে ! কি হয়েচে আজকাল তোমার ?

গদাধর এ-কথার উত্তর দিলেন না। সংসার হঠাৎ তাঁহার কাছে নিতান্ত বিস্বাদ মনে হইল। অনঙ্গ আধ-ময়লা একখানা সাড়ী পরিয়া আছে, মাথার চুল এখনও বাঁধে নাই, কেমন যেন অগোছালো ভাব—তাছাড়া ওর মুখ দেখিলেই মনে হয়, এই বয়সে বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে যেন।

কিসের জন্য তিনি এসব করিয়া মরিতেছেন ? কাহার জন্য পাটের দালালি আর দুপুরের রোদে-রোদে মোকামে-মোকামে

ঘুরিয়া পাটের কেনা-বেচা ? সত্যিকার জীবনের আমোদ কি তিনি একদিনও পাইয়াছেন ? পুরুষ-মানুষের মন যা চায় নারীর কাছে —অনঙ্গ কেন, কোনো মেয়ের কাছেই কি এতদিন তা পাইয়াছেন ? জীবনে তিনি কি দেখিলেন, কি-বা পাইলেন ! এই কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপ, ওই আধ-ময়লা ভিজে-কাপড়ের রাশি, ওই কয়লা-কাঠের গাদা, আলু-বেগুনের চুব্‌ড়িটা—এই সংসার ? এই জীবন ? ইহাই তিনি চিরকাল দেখিবেন ও জানিবেন ?

শচীনকে গ্রামের লোকে নিন্দা করে, কিন্তু শচীন তাঁহার চেয়ে ভালো। সে জীবনকে ভোগ করিয়াছে। তিনি কি করিয়াছেন ? কিছুই করেন নাই !

অনঙ্গ বলিল—বড় ঠাণ্ডা পড়েচে, আজ আর কোথাও বেরিও না সন্ধ্যের পর।

—সন্ধ্যের এখনও অনেক দেরী। আড়তের কাজ মেটেনি, সেখানে যেতে হবে এখুনি।

—কখন আসবে ?

—তা কি করে বলি ? কাজ মিটে গেলেই আসবো।

—ভড়মশায় কি রাত্রে এখানে খাবেন ?

—কেন, সে খাচ্চে কোথায় ? ওবেলা আসেনি ?

—আজ দুদিন তো আসেন না। একটু জিগ্যেস্ কোরো তো। দুদিন ভাত রান্না রইলো, অথচ লোক এলো না। আর তুমিও দেরি কোরো না।

কথা শেষ করিয়াই অনঙ্গ আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—

সত্যি, আমার ওপর তুমি রাগ করোনি ? আজ তুমি সকাল-সকাল এসো। গাঁয়ে গেলে, কি-রকম দেখলে না-দেখলে কিছুই শুনিনি। শুনবো-এখন। এসো সকাল-সকাল—কেমন তো ?

গদাধর আড়তে যাইবার পথে ভাবিলেন—কি বিশ্রী জীবন ! এক-ঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে ! আর ভালো লাগে না এ !

সেই রাত্রেই সন্ধ্যার পরে গদাধর শোভারাণীর বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া বলিল—কে ?

—মিস্ মিত্র আছেন ?

—মাইজি ষ্টুডিও থেকে ফেরেননি।

—কখন আসেন ?

—আজ সকাল-সকাল আসবেন ব'লে গিয়েচেন—এই আটটা···

—ও ! আচ্ছা, থাক্ তবে।

—কিছু বলতে হবে, বাবু ?

—না—আচ্ছা—না, থাক্। আমি অন্য এক-সময় বরং···

বলিতে-বলিতে দরজার সামনে শোভারাণীর মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া গদাধরকে দেখিয়া শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনি এখন ? কি বলুন তো ?

গদাধর হঠাৎ যেন সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া গেলেন। কেন এখানে আসিয়াছেন, তাহার কি উত্তর দিবেন ? নিজেই কি তাহা ভালো বুঝিয়াছেন ? বোঝেন নাই ! কিন্তু তিনি কোনো-কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শোভা অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিল—আসুন,

চলুন ওপরে। আপনি যে-রকম মানুষ, তাতে পাটের আড়তদার হওয়া উচিত ছিল না, উচিত ছিল কবি হওয়া। আসুন।

এইদিন হইতে গদাধর আড়ত হইতে সন্ধ্যার পরে প্রায়ই দেরীতে বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন। অনঙ্গ প্রথম-প্রথম কত বকিত, রাগ করিত, এত রাত হইবার কারণ কি—শরীর খারাপ হইলে টাকায় কি হইবে? এত পরিশ্রম শরীরে সহিবে কেন? ইত্যাদি। গদাধর প্রায়ই কোনো উত্তর দিতেন না। যখন দিতেন, তখন নিতান্তই সংক্ষেপে। কি যে তার অর্থ, তেমন পরিষ্কার হইত না। বাড়ী ফিরিয়া গদাধর সব দিন খাইতেনও না, না খাইয়া শুইয়া পড়িতেন। অনঙ্গ নিজেদের শোবার ঘরে খাবার আনিয়া যত্ন করিয়া জাল দিয়া ঢাকা দিয়া, জাগিয়া বসিয়া থাকে, স্বামী কখন আসিয়া কড়া নাড়িবেন—কারো সাড়া না পাইলে রাগ করিয়া বসিবেন হয়তো!

শীত চলিয়া গেল। ফাগুনের প্রথম সপ্তাহ।

এবার পাটের কাজে বেশ লাভ হইয়াছে—গদাধর সেদিন কথায়-কথায় প্রকাশ করিয়াছেন স্ত্রীর কাছে।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। অনঙ্গ বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে—পূজা হইবার পরে আড়তের লোকজন খাওয়ানো হইবে, আশপাশের দু'চারজন প্রতিবেশীকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

আড়তের কর্ম্মচারীদের বসাইয়া লুচি খাওয়ানো হইবে, বাকি সকলকে সত্যনারায়ণের প্রসাদ ও ফলমুল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্বারা জলযোগ করানো হইবে।

অনঙ্গ সারাদিন উপবাস করিয়া আছে, স্বামী ফিরিলে পূজা আরম্ভ হইবে এবং তাহার পর সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পাশের গলিতে সিধুর মা নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বিধবা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন, তাঁহার একটি মাত্র ছেলে সামান্য মাহিনার চাকুরী করে। অনঙ্গ তাঁহাকে এবেলা খাইতে বলিয়াছে কিন্তু তিনি আসিয়া পূজার নৈবেদ্য ইত্যাদি গুছাইয়া দিয়াছেন—অনঙ্গ তাঁহাকে একটু অনুরোধ করিয়াছিল সন্ধ্যার পরে, তিনি বলিয়াছেন,—এখন কেন মা, পূজো-আচ্চা হয়ে যাক্, বিধবা মানুষ, একেবারে সকলের শেষে যাহয় কিছু মুখে দেবো। তুমি রাজরাণী হও ভাই, তোমার বড্ড দয়া গরীবের ওপরে! আমার ছেলে তো মাসিমা বলতে অজ্ঞান!

সন্ধ্যার পরে পূজা আরম্ভ হইল। লোকজন একে-একে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকেরাও আসিলেন। এখনও গদাধর আসেন নাই—তিনি আসিলেই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো সুরু হইবে।

অনঙ্গ আজ খুব ব্যস্ত। নিজে সে রান্নার তদারক করিয়াছে বৈকাল হইতে। সব দিকে চোখ রাখিয়া চলিতে হইয়াছে, যাহাতে কেহ কোন ত্রুটি না ধরে। পূজা শেষ হইয়া রাত হইয়া পড়িল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্বামী এখনও আসেন নাই! দু'একজন তাগাদাও দিলেন, তাঁহাদের সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে হইবে, কাজ আছে অন্যত্র।

হরিয়া চাকরকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—গ্যাখ তো, আড়ত থেকে কেউ এসেচে ?

হরিয়া বাহিরের ঘর দেখিয়া আসিয়া বলিল—চার-পাঁচজন এসেচে মাইজি। তবে ভড়মশায় আসেননি এখনো।

সিধুর মাকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—কি করবো দিদি, সব খেতে বসিয়ে দিই, কি বলেন ? উনি বোধ হয় কাজে আটকে পড়েছেন। ভড়মশায় যখন আসেননি—তখন দু'জনে কাজ শেষ ক'রে চাবি দিয়ে একসঙ্গে আসবেন। এদের বসিয়ে রেখে কি হবে ?

সিধুর মা বলিলেন—তাই বসিয়ে দাও। আমি সব দিয়ে আসচি গিয়ে—আমায় সাজিয়ে দাও।

বাহিরের লোক সব প্রসাদ খাইয়া চলিয়া গেল। আড়তের লোকদের খাওয়াইতে বসান হইল না, গদাধর ও ভড়মশায়ের অপেক্ষায়। রাত ক্রমে দশটা বাজিল। তখন আর কাহাকেও অভুক্ত রাখিলে ভালো দেখায় না, সিধুর মার পরামর্শে তাহাদেরও বসাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের খাওয়া শেষ হইল, রাত তখন প্রায় এগারোটা। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রি—গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিকের আলোর বাধা ঠেলিয়াও এখানে-ওখানে স্ব-মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এমন সময় ভড়মশায় আসিলেন—একা।

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া ভড়-মশায়কে বলিল—উনি কই ? এত দেরী কেন আপনাদের ?

ভড়মশায় বলিলেন—আমি হাটখোলায় তাগাদায় বেরিয়েছি

ন'টার আগে। উনি তো তখুনি বেরুলেন—আমি ভাবচি এতক্ষণ বুঝি এসেছেন।

ভড়মশায়ের গলার স্বর গম্ভীর। তিনি কি একটা যেন চাপিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অনঙ্গ ব্যস্ত ও ভীতকণ্ঠে বলিল—তাহ'লে উনি কোথায় গেলেন, তার খবরটা একবার নিন্—সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল না কি?

ভড়মশায় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না, সে-সব ছিল না। ভয় নেই কিছু। নইলে কি আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকি বৌমা? তিনি হারিয়েও যাননি বা অন্য কোনো-কিছু না।

অনঙ্গ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—যাক্, তবুও বাঁচা গেল। কাজে গিয়ে থাকেন, আসবেন-এখন—তার জন্যে ভাবনা নেই, কিন্তু এত রাত হয়ে গেল, বাড়ীতে একটা কাজ, তাই বলচি।

ভড়মশায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—একটা কথা, মা, বলি তবে। ভেবেছিলাম, বলবো না—কিন্তু না বলেও তো পারিনে।

অনঙ্গ ভড়মশায়ের মুখেব ভাবে ভীত হইয়া বলিল—কেন, কি হয়েচে? কি কথা?

—আমি বলেচি, এ-কথা যেন বাবুর কানে না ওঠে! আপনাকে মেয়ের মত দেখি, তেরো বছরের মেয়ে যখন প্রথম ঘর করতে এলেন, তখন থেকে দেখে আসচি, কথাটা না বলেও পারিনে। উনি আর সে বাবু নেই। এখন কোথায় গিয়ে যে রাত পর্য্যন্ত থাকেন, সকাল-সকাল আড়ত থেকে বেরিয়ে যান—সন্দের আগেই চলে যান এক-এক দিন। তারপর শুধু তাই নয়, এ-সব কথা না বললে, বলবেই বা কে,

আমি হচ্চি পুরোনো লোক···এক-কলমে আজ পঁচিশ বছর আপনাদের আড়তে কাজ করচি আপনার শ্বশুরের আমল থেকে। আজকাল ব্যাঙ্কের টাকাকড়িও উনি গোলমাল করচেন। সেদিন একটা একহাজার টাকার চেক্ ভাঙাতে গেলেন নিজে—কিন্তু খাতায় জমা করলেন না। নিজের নামে হাওলাত-খাতে লেখালেন। এই ক'মাসের মধ্যে প্রায় সাড়ে-ছ'হাজার টাকা হাওলাত লিখেচেন নিজের নামে। এসব ঘোর অব্যবস্থা। উনি যেন কি হয়েচেন, সে বাবু আর নেই—এখন কথা বলতে গেলেই খিঁচিয়ে ওঠেন, তাই সাহস ক'রে কিছু বলতেও পারিনে।

অনঙ্গ পাংশুমুখে সব শুনিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভড়মশায় বলিলেন—আমার মনে হয় বৌমা, আমাদের সেই গাঁয়েই আমরা ছিলাম ভালো। বেশি টাকার লোভে কলকাতা এসে ভালো করিনি।

অনঙ্গ উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল—এখন উপায় কি বলুন ভড়মশায়—যা হবার হয়েছে, সে-কথা ছেড়ে দিন।

—আমি তলায়-তলায় সন্ধান নিচ্চি। এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি, উনি কোথায় যান, কি করেন। তবে লক্ষণ ভালো নয় সেইদিনই বুঝেচি, যেদিন বড়-তরফের শচীনবাবু ওঁর সঙ্গে মিশেচে! শচীন আর মাঝে-মাঝে আসে নির্ম্মল।

—তবেই হয়েচে! আপনি ভালো ক'রে সন্ধান নিন্ ভড়মশায়—আমার এ কলকাতা সহরে কেউ আপনার জন নেই—এক আপনি ছাড়া। আপনি নিজে বুঝে-সুঝে ব্যবস্থা করুন। আমিও দেখচি

ক'মাস ধ'রে উনি অনেক রাত্রে বাড়ী আসেন—আমি কাউকে সে-কথা বলিনি। তা আমি ভাবি, আড়তের কাজ বেড়েচে, তাই বুঝি রাত হয়। মেয়েমানুষ কি বুঝি বলুন? আসুন, আপনি আর কতক্ষণ ব'সে থাকবেন, খেয়ে নেবেন চলুন। ভগবান যা করবেন, তার ওপর হাত নেই—অদেষ্টে যা আছে, ও আর ভেবে কি করবো!

চোখের জলে অনঙ্গ কথা শেষ করিতে পারিল না।

ঠিক সেই রাত্রে বাগমারী রোড ছাড়াইয়া খালধারের বাগান-বাড়ীতে জলশা বসিয়াছে। গদাধর সেখানে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। এই কয় মাসের মধ্যেই শচীনের মধ্যস্থতায় আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে গদাধরের আলাপ হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কথা কহিয়া গদাধরের মন ভরিয়া ওঠে! মনে হয়, এতকাল গ্রামে পাটের বস্তা লইয়া কি করিয়াই না দিন কাটাইয়াছেন! যৌবনের দিনগুলো একেবারে নষ্ট হইয়াছে!

এখানে এই বিলাসের জগতে ইহারা মায়া বিভ্রম জাগাইয়া তোলে! মনে হয় ব্যবসায় যদি করিতে হয় তো এই ফিল্মের ব্যবসায়! কতকগুলো ম্যানেজার, গোমস্তা সরকার, দারোয়ান কুলির কোনো সংস্রব নাই—এমন সব কিশোরী…তাহাদের সঙ্গে আলাপ, গানের ঝর্ণাধারা…এমন অন্তরঙ্গতা করিতে জানে, মনে হয়, পৃথিবী যেন মায়াপুরী হইয়া ওঠে! ওই শচীন খুব আলগাভাবে কাণে মন্ত্র দেয়—পাটের কারবার তো করেচো—পয়সা পিটছো খুবই। চালু কারবার—পাকা মুহুরি গোমস্তা আছে—সে-কাজ তাহারা

অনায়াসে দেখিতে পারে—আমি বলি কি, ফিল্মের ব্যবসায় যদি নেমে যাও—এ ব্যবসায় সারা পৃথিবী কি-টাকাটা অনায়াসে রোজগার করিতেছে! এ কারবারে লোকসানের কোনো ভয় নাই, শুধু লাভ আর লাভ! তাছাড়া এই সব মেয়ে—তোমাকে একবারে—

শচীন ওস্তাদ মানুষ···মানুষ চরাইয়া খায়। জানে, কোন্ টোপে কোন্ মানুষকে গাঁথা যায়।···শচীন বলে—কিছু না সামান্য পুঁজি ফেলো—নিজে গ্যাট্ হইয়া সেখানে বসিয়া থাকো। দিনের কাজের হিসাব রাখো। ষ্টুডিও ভাড়া পাওয়া যায়—ফিল্মের রোল ধারে যত চাও—গাঁট হইতে কিছু টাকা ছাড়ো—ছবির তিন-ভাগ চার-ভাগ তোলা হইবামাত্র—ডিষ্ট্রিবিউটর আসিয়া কম্‌সেকম্ আগাম ষাট-সত্তর হাজার টাকা নিজের তহবিল হইতে বার করিয়া দিবে,—তার পাঁচ গুণ টাকা আদায় হইয়া আসিবে—ছবি তৈয়ার হইলে সে ছবি ঘুরিবে সারা বাঙলা মুল্লুকে—তার হিন্দী করো, হোল-ইণ্ডিয়া। একখানা ছবির বাঙলা-হিন্দী দু-ভার্শনে এক বছরে নিট লাভ বিশ-পঁচিশ লাখ হইবে। দু-চারিটা দৃষ্টান্তও শচীন দিল—ঐ সব কোম্পানির মালিক ফিল্ম কোম্পানির অফিসে কেরানীগিরি করিত দেড়শো-দুশো টাকা মাহিনায়। এদিকে নজর রাখিয়া চলিত—ফশ করিয়া মাড়োয়ারি ক্যাপিটালিষ্ট ধরিয়া আজ অত বড় কোম্পানির মালিক! মোটর ছাড়া পথ চলে না—কি প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়াছে আলিপুরে! টাকার কুমীর বনিয়াছে। কি মান, কি ইজ্জৎ···ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়াছে···নিরেট ছেলে একবার বিলাত ঘুরিয়া আসিলেই—ব্যস্!

গদাধর শোনেন। গদাধরের মনে হয়, কারবার—ব্যবসা—লাভ—শুধু তা নয়, এমন মধুর সংসর্গ! নাচ-গান…হাসি-গল্প…এ সবের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না!…সেদিন শোভারাণী একটা গান গাহিতেছিল…সে গানের কটি লাইন তাঁহার কানে-মনে সব-সময়ে বাজিতেছে—

বসন্ত চলে গেল হায় রে,—
চেয়েও দেখিনি তার পানে।

গদাধরের কেবলি মনে হয়—ও গান তাঁহারি মনের কথা। জীবনের কতখানি কাটিয়া গেল…পৃথিবীতে এমন রূপ-রস-গন্ধ—তার কোনো পরিচয় তিনি পাইলেন না!

এখনো…এখনো যদি কিছু পান।

আজ এ আসরে শচীন তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। —বলিয়াছে, ফিল্মের সকলে আসিবে।—সকলের সঙ্গে আলাপ করো—মেলামেশা করো—ভালো করিয়া দেখো, শুধু ব্যবসার দিক দিয়া। শচীনের সঙ্গে কত বার কত স্টুডিওয় তিনি গিয়াছেন।

আরো কজন ফিল্ম-স্টারের সঙ্গে গদাধরের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের সকলকেই কত ভালো লাগে! তাহারা যেন অন্য লোকের জীব! গান আর সুর দিয়া তৈরী!

তাহারা সকলেই আছে। দোল-পূর্ণিমার রাত। বারোমাস খাটিয়া একটা দিন আমোদ না করিলে চলে? এখানে আজ স্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আনন্দ-সম্মেলন। আজ রাত্রে এইখানেই গদাধরের ফিল্ম স্টুডিও খুলিবার কথাবার্ত্তা হইবে, ঠিক আছে!

দম্পতি

বাগানটা বেশ বড়। বোনেদী বহুকালের পুরানো প্রমোদ-কানন। মাঝখানে যে বাড়ী আছে—সেটা দোতলা। অনেকগুলি ঘর ওপরে নীচে, মেঝে মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো। দেওয়ালে বিবর্ণপ্রায় বড়-বড় অয়েলপেণ্টিং—অধিকাংশই নগ্ন নারী-মূর্ত্তির ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোনো বিলাসী ধনী ব্যক্তি সখ করিয়া বাগান-বাড়ী করাইয়া থাকিবেন! সে অতীত ঐশ্বর্য্য ও সৌখীনতার চিহ্ন এর প্রতি ইষ্টকখণ্ডে। বাগান-বাড়ীর একটা ঘর তালাবন্ধ। তার মধ্যে অনেক পুরানো বাসনপত্র, ঝাড়, কার্পেট, কৌচ, কেদারা, আয়না প্রভৃতি গাদা করা। প্রবাদ এই, সেই ঘরে মাঝে-মাঝে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ৺আনন্দনারায়ণ ঘোষকে চোগাচাপকান ও শাম্‌লা পরিয়া একতাড়া কাগজ হাতে ঘুরিতে-ফিরিতে দেখা গিয়াছে। সেকালের বিখ্যাত এটর্নি আনন্দনারায়ণ ঘোষের নাম এখনও অনেকে জানেন।

পুকুর-ধারে শচীন বসিয়াছিল—পাশে গদাধর এবং রেখা বলিয়া একটি মেয়ে।

রেখা বলিতেছিল—আমাদের ষ্টুডিওতে আপনি রোজ বলেন যাবো,—যাবো—কৈ, একদিনও গেলেন না তো!

গদাধর হঠাৎ জড়িতস্বরে বলিলেন—আড়ত থেকে বেরোই আর তোমাদের ষ্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়—যাই কখন বলো, রেখা?

—না, আমার পার্টটা না দেখলে আপনি আমায় নেবেন কি ক'রে?

—আরে, তোমায় এমনিই নিয়ে নেবো, পার্ট দেখতে হবে না। চমৎকার চেহারা তোমার, তোমায় বাদ দিলে কি ক'রে হবে?

—সুষমা দিদিকেও নিতে হবে।

—নেবো। তুমি যাকে যাকে বলবে, তাদের সবাইকে নেবো।

—সুষমা দিদির মত গান কেউ গাইতে পারবে না। দেখলেন তো সেদিন, রুক্মিণীর গানে কেমন জমালে?

—চমৎকার গান—অমন শুনিনি।

শচীন পাশ হইতে বলিল—তুমি যা শোনো, সব চমৎকার! গানের তুমি কি বোঝো হে? আজ সুষমার গান শুনো-এখন, বুঝতে পারবে। সত্যি ওকে বাদ দিয়ে ছবির কাজ চলবে না। একটু বেশি মাইনে চাইচে, তা দিয়েও রাখতে হবে। নীলা, দীপ্তি—ওদেরও ছাখো—এখানে ডাক দাও না সব—মিনি, সুবালা, বড় হেনা, ছোট হেনা···

গদাধর ব্যস্তভাবে বলিলেন—না, না, এখানে ডেকে কি হবে? থাক্ সব, আমি যাচ্ছি।

পাঁচ

বাগানের বাড়ীটার সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে কলমের আমগাছ অনেকগুলি—ওদিকের অংশটা তারের জাল দিয়া ঘেরা। কারণ, এখন আমের বউলের, শুঁটির সময় আসিতেছে—ইজারাদার ঘিরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কলম-বাগান ও পুকুরের মাঝখানে এখনও বেশ ভালো-ভালো গোলাপ হয়—এখানে বাঁধানো চবুতারায় একটা দল ভিড় করিয়া বসিয়া গল্পগুজব ও হল্লা করিতেছে।

শচীন বলিল—অঘোরবাবুকে তাহ'লে ডাকি। আজ দোল-পূর্ণিমা, শুভ দিন—একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল। যেমন কথা আছে।

—অঘোরবাবু এসেচেন ?

—এই তো মোটরের শব্দ হলো,—এলেন বোধহয়। স্টুডিওর মোটর আনতে গিয়েছিল কিনা !

—বেশ, ক'রে ফেল সব ব্যবস্থা।

প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক সৌখীন প্রৌঢ় লোক,—রং শ্যামবর্ণ, বেঁটে, একহারা চেহারা—মাথার চুলে এই বয়সেও ব্রিলেণ্টাইন্ মাখানো, মুখে সিগারেট—আসিয়া ঘাটের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—এই যে, সব এখানে !

শচীন ও গদাধর দু'জনে ব্যস্ত হইয়া বলিল—আসুন, আসুন। অঘোরবাবু, আপনার কথা হচ্ছিল।

রেখার দিকে চাহিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—তাইতো, আমাদের একটা কথা ছিল। না হয় চলুন ওদিকে।

রেখা অভিমানের সুরে বলিল—বললেই হয় যে উঠে যাও, অমন ক'রে ভণিতা করবার কি অধিকার আপনার আছে মশাই ?

হাসিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—না রেখা বিবি, অধিকার কিছু নেই, জানি ! এখন লক্ষ্মীটি হয়ে দু-পা একটু কষ্ট ক'রে এগিয়ে গিয়ে, ওই চাতালে ব'সে যারা স্ফূর্ত্তি করচে, ওখানে যাওনা ! আমরা একটু পাতলা হয়ে বসি।

রেখা রাগ করিয়া বলিল—অমন রেখা-বিবি, রেখা-বিবি বলবেন না বলচি। ও কেমন কথা ! না, আমি অমন সব ধরণের কথা ভালোবাসিনে !

রেখা উঠিয়া ফড়ফড় করিয়া চলিয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলেন—তারপর, আপনি তো এই আছেন দেখছি। একটা ব্যবস্থা তাহ'লে হয়ে যাক্ ! আজ শুভদিন—দোলযাত্রা—পূর্ণিমা তিথি।

শচীন বলিল—আর এদিকে পূর্ণিমের চাঁদের ভিড়ও লেগে গিয়েচে ঘোষেদের বাগান-বাড়ীতে—আমার মত যদি নাও, তবে···

অঘোরবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—অহো, তোমার সব-তাতে ঠাট্টা আর ইয়ার্কি ভালো লাগে না। শোনো না, কি কথা হচ্চে !

গদাধর বলিলেন—আপনি হিসেবটা করেচেন মোটামুটি ?

—হ্যাঁ, এখন এগারো হাজার আন্দাজ বার করতে হবে আপনাকে।

সব হিসেব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্চি। আজ চেক-বই এনেচেন? পাঁচ হাজার আজই দরকার। বাগানটার লিজ রেজেষ্ট্রি হবে সোমবারে—সেলামির টাকা আর এক বছরের ভাড়া আজ জমা দিতেই হবে। অনেকখানি জমি আছে—ষ্টুডিওর উপযুক্ত জায়গা বটে! আর একটা কাজ করতে হবে আজ—সব মেয়েদের আজ কিছু কিছু বায়না দিয়ে হাতে রাখা চাই। এই ধরুন, রেখা আছে, খুব ভালো নাচ অর্গানাইজ করে। ওকে রাখতে হবে। তারপর ধরুন সুষমা—ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম ষ্টুডিওতে এখনও কাজ করে, ওকে আগে আটকাতে হবে। একবার ওদের সব ডাকিয়ে এনে যার-যার নাচ-গান দেখে-শুনে নেবেন নাকি?

শচীন বলিল—না, না, সেটা ভালো হয় না। ওরা সবাই নামজাদা আর্টিষ্ট—ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় কাজ করচে, কেউ-বা করেচে—ওদের নাম কে না জানে? এই ধরুন, সুষমা···

অঘোরবাবু আঙুলে টাকা বাজাইবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—আরে রেখে দাও আর্টিষ্ট্—সবাই আর্টিষ্ট। আমিই কি কম আর্টিষ্ট? টাকা খরচ করতে হবে যেখানে, সব বাজিয়ে নেবো—এইরকম ক'রে বাজিয়ে নেবো। আমি বুঝি, কাজ। এই অঘোরনাথ হালদার সাতটা ফিল্ম কোম্পানি এই হাতে গড়েচে, আবার এই হাতে ভেঙেচে। ও কাজ আর আমায় তুমি শিখিও না।

গদাধর বলিলেন,—যাক্, ওসব বাজে কথায় কান দেবেন না। আপনি যা ভালো বুঝবেন, করুন! কত টাকা চাই এখন বলুন?

—তাহ'লে ওদের সব ডাকি। পৃথক্-পৃথক্ কণ্ট্রাক্ট হোক্—

সোমবার সব রেজেষ্ট্রি হবে—লিজের সেলামী দু'হাজার আর ভাড়া পাঁচশো—এ টাকাটি আলাদা ক'রে রেখে বাকি ওদের দিয়ে দেবো।

—ওদের টাকা এখন দিতে হবে কেন? কণ্ট্রাক্ট রেজেষ্ট্রি হবার সময় টাকা দিলেই চলবে।

—না, না, এ তো বায়না। অঘোর হালদার অত কাঁচা কাজ করে না স্যর।

—বেশ।

রেখার ডাক পড়িল পুকুর-ঘাটে। অঘোর বাবু বলিলেন—রেখা বিবি, লেখাপড়া জানো তো? ফর্ম্ম সই করতে হবে এখুনি।

—আবার রেখা বিবি?

—বেশ, কি ব'লে ডাকতে হবে, শিখিয়ে দাও না হয়!

—কেন, রেখা দেবী···পোস্টারে লেখা থাকে দেখেননি কখনো? রেখা বিবি বললে আমি জবাব দিইনে।

বলিয়া রেখা নাক উঁচু করিয়া গর্ব্বিতভাবে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া চমৎকার ভাবে সপ্রমাণ করিল যে, সে একজন সুনিপুণ অভিনেত্রী—যদিও ভঙ্গিটা বিলিতি ছবির অভিনেত্রীদের হুবহু নকল!

অঘোরবাবু বলিলেন—এখানে সই করো, বেশ পষ্ট ক'রে লেখো—

রেখা নিজের ব্লাউশের বুকের দিকটা হইতে ছোট একটা ফাউণ্টেন পেন বাহির করিতেই অঘোরবাবু বলিয়া উঠিলেন—আরে,

বলো কি ! তোমার আবার ফাউন্টেন পেন বেরুলো কোথা থেকে—য়্যাঁ ! তুমি দেখচি কলেজের মেয়ে কি ইস্কুলের মাষ্টারনী বনে গেলে ! বলি, কালি-কলমের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক, জিজ্ঞেস করি ? টাকাটা লেখো, টাকা।

—কত টাকা ? যথেষ্ট অপমান তো করলেন।

—মাছের মায়ের পুত্র-শোক ! অপমান কিসের মধ্যে দেখলে ? সত্তর টাকার মধ্যে বায়না আজ পাঁচ টাকা।

রেখা রাগ করিয়া কলম বন্ধ করিয়া বলিল—পাঁচ টাকা ? চাই না, দিতে হবে না। পাঁচ টাকা এ্যাডভান্স্ নিয়ে যারা কাজ করে, তারা একষ্ট্রা ভিড়ের সিনে প্লে করে—আর্টিষ্ট্ নয়। আমাদের অপমান করবেন না।

—কত চাও রেখা দেবী, শুনি ?

—অর্দ্ধেক—পঁয়ত্রিশ টাকা—থার্টি-ফাইভ্ রুপিজ্ !

—থাক্ থাক্, আর ইংরিজি বলতে হবে না। দিচ্ছি আমি, তাই দিচ্ছি। আমাদের একটু নাচ দেখাবে তো ? লেখো টাকাটা।

—পরে হবে-এখন।

—এখনই হবে, ক্যাপিটালিষ্ট্ দেখতে চাচ্ছেন—ওঁর ইচ্ছে এখানে সকলের বড়।

রেখা দ্বিরুক্তি না করিয়াই পেশাদার নর্ত্তকীর সহজ ও বহুবার-অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পুকুর-ঘাটের চওড়া চাতালের উপর আধুনিক প্রাচ্য-নৃত্য সুরু করিল। রেখা কৃশাঙ্গী মেয়ে। নাচের উপযুক্ত দেহের গড়ন বটে—জ্যোৎস্না রাত্রে নৃত্যরতা তরুণীর বিভিন্ন লাস্যভঙ্গি

দেখিয়া গদাধর ভাবিলেন—টাকা সার্থক হয় এই ব্যবসায়। খরচ করেও সুখ, লাভ যদি পাই তাতেও সুখ! যে বয়সের যা—আমার বয়েস তো চলে যায়নি এ-সবের।

অল্প একটু বিশ্রাম করিয়া রেখা বলিল—কথাকলি দেখবেন? সেবার এম্পায়ারে এসেছিলেন সত্যভামা দেবী—মাদ্রাজী মেয়ে, অমন কথাকলি আর কখনো···কি পোজ্ এক-একখানা! আমরা ষ্টুডিও সুদ্ধু নাচিয়ের দল এম্পায়ারে দেখতে গিয়েছিলুম কোম্পানির খরচে। দেখবেন?

—তুমি একবার দেখেই অমনি শিখে নিলে?

—কেন নেব না, আমরা আর্টিষ্ট্ লোক!

—আচ্ছা, থাক্ এখন কথাকলি। সুষমা দেবী কই? তাঁকে ডেকে ফর্ম্মটা সই ক'রে নেওয়া দরকার।

ডাক দিতে সুষমা আসিল। দেখিতে ভালো নয়, দোহারা চেহারা—গলার স্বর বেশ মিষ্ট! বেশি কথা বলে না, তবে সে আসিয়া সমস্ত জিনিষটা একটা তামাসার ভাবে গ্রহণ করিল।

অঘোরবাবু বলিলেন—টাকাটা লিখুন আগে—চল্লিশ টাকা।

সুষমা কোনো কথা না বলিয়া নাম সই করিয়া চেক্ লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, অঘোরবাবু বলিলেন—উঁহু, গান গাইতে হবে একটা।

সুষমা হাসিয়া বলিল—সে কি? এখন কখনো গান হতে পারে?

—ক্যাপিটালিষ্ট্ বলচেন,—ওঁর কথা রাখতে হবে। গান করুন একটা।

গদাধর মোলায়েম ভাবে বলিলেন—না, না, থাক্। উনি নাম-করা গায়িকা—সবাই জানে। ওঁকে আর গান গাইতে হবে না। ও নিয়ম সকলের জন্যে নয়।

রেখা কাছেই ছিল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—নিয়মটা তবে কি আমার মত বাজে লোকদের জন্যে তৈরী? এ তো রীতিমত অপমানের কথা। না, এ কখনো···

ইহাদের কি করিয়া চালাইতে হয়, অঘোরবাবু জানেন। তিনি রেখার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিলেন—রেখা বি—মানে দেবী, চটো কেন? গান আমরা সর্ব্বদা গ্রামোফোনে শুনচি, রেডিওতে শুনচি। কলকাতায় তো গান শোনবার অভাব নেই—কিন্তু নাচ আমরা সর্ব্বদা দেখি নে—তোমার মত আর্টিস্টের নাচ দেখার একটা লোভও তো আছে—বুঝলে না?

গদাধরের বেশ লাগিতেছিল। বাড়িতে থাকিলে এতক্ষণ তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—নয়তো বসিয়া গদির হিসাবপত্র দেখিতেছেন। এ তবু পাঁচজনের মুখ দেখিয়া আনন্দে আছেন—বিশেষ করিয়া এমন সঙ্গ, এমন একটা রাত। একবার তাঁহার মনে হইল, অনঙ্গ আজ একটু সকাল-সকাল ফিরিতে বলিয়াছিল, বাড়ীতে যেন কি পূজা হইবে। তা তিনি গিয়া কি করিবেন? ভড়মশায় আছে, নিতাই আছে—দু'জন চাকর আছে—তাহারাই সব দেখাশুনা করিতে পারিবে এখন। তাঁহার অত গরজ নাই।

একে-একে অনেকগুলি মেয়ের কণ্ট্রাক্ট-ফর্ম্ম সই করা হইয়া

গেল। তাহারা পুকুরের সামনের পাড়ে—যেখানে সাবেক কালের গোলাপবাগ, সেদিক হইতে আসে—আসিয়া সই করিয়া আবার গোলাপবাগে ফিরিয়া যায়—যেন একগাছি ফুলের মালা ঢল হইয়া গিয়াছে—এক-একটি করিয়া ফুল সরিয়া-সরিয়া সূতার এদিক হইতে ওদিকে নাচের ভঙ্গিতে চলিতেছে······

গদাধর কি একটা ইঙ্গিত করিলেন একজন চাকরকে।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন আর না স্যর, যদি আমায় মাপ করেন। কাজের সময় ইয়ে ওটা বেশি না খাওয়াই ভালো। হ্যাঁ, আর-একটা কথা স্যর—যদি বেয়াদবি হয়, মাপ করবেন। আপনি ক্যাপিটালিস্ট্, মালিক—একটু রাশভারি হয়ে চলবেন ওদের সামনে। ওরা কি জানেন, 'নাই' যদি দিয়েচেন, তবে একেবারে মাথায় উঠেচে! ধম্‌কে রাখুন, ঠিক থাকবে। 'নাই' ওদের কখনো দিতে নেই। ওই রেখা···আপনার সামনে অত-সব কথা বলতে সাহস করবে কেন? আমি এর আগে ছিলাম বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম-এ—ক্যাপিটালিস্ট্ ছিল দেবীচাঁদ গোঠে, ভাটিয়া মার্চ্চেণ্ট! ক্রোড়পতি। গোঠে যখন ষ্টুডিওতে ঢুকতো—তার গাড়ীর আওয়াজ পেলে সব থরহরি লেগে যেতো। ওই শোভা মিত্তিরের মত—নাম শুনেচেন তো? অমন দরের বড় আর্টিষ্টও গোঠেজির সামনে ভালো ক'রে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করতো না। শোভারাণী মিত্তিরের কাছে রেখা-টেখা এরা সব কি? শোভা এখন এদের এই কোম্পানিতে কাজ করে শুনচি।

গদাধর চুপ করিয়া শুনিলেন।

চাকর আসিয়া এই সময় জানাইল, খাবার জায়গা হইয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—সব ডেকে নিয়ে যা। আমি আর ইনি এখন না—পরে হবে।

চাকর বলিল—জী আচ্ছা।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন খেতে বসলে, ওদের সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে হবে—সেটা ঠিক হবে না মশাই। নিজের চাল বজায় রেখে, নিজেকে তফাৎ রেখে চলতে হবে, তবে ওরা মানবে, ভয় করবে!

গোলাপবাগের মধ্যে যে দলটি ছিল, তাহারা হল্লা করিতে-করিতে খাইতে গেল। রাত দেড়টার কম নয়। একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, চাঁদের আলোয় বাগানের পুরানো চাতাল, হাতভাঙা পরীর মূর্ত্তি, হাতল-খসা লোহার বেঞ্চি, শুক্‌নো ফোয়ারা ইত্যাদি এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ এমন একটা জগৎ, যেখানে যে-কোনো অসম্ভব ঘটনা যেন যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে! এখন হঠাৎ যদি চোগা-চাপকান-পরা, শামলা মাথায় ৺আনন্দনারায়ণ ঘোষ মহাশয় এক তাড়া কাগজ হাতে, তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া ওই হাতভাঙা পরীর মূর্ত্তিটার আড়াল হইতে ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসেন—তবে যেন কেহই বিস্মিত হইবে না।

গদাধর বলিলেন—আর কত টাকা লাগবে?

—আরও দু'হাজার তো কালই চাই—মজুত রাখবেন স্যর। তাহলে আপনার হলো এগারো হাজার।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

—আপনার গদিতে।

—না। আমার গদিতে এখন যাবার দরকার নেই। এ ব্যাপারটা একটু প্রাইভেট রাখতে চাই।

—তাহলে ওই ছ' হাজারের চেক্‌টা?

—কাল আমায় ফোন্ করবেন—ব'লে দেবো, কোথায় গিয়ে নিতে হবে।

—যে আজ্ঞে, স্যর। আপনি যেমন আদেশ দেবেন, সেইভাবে কাজ হবে। আমার কাছে কোনো গোলমাল পাবেন না কাজের, আপনি টাকা ফেলবেন, আমি গ'ড়ে তুলবো। এই আমার কাজ—এজন্যে আপনি আমায় মাইনে দেবেন, শেয়ার দেবেন—আপনি কাজ দেখে নেবেন। আমায় তো এমনি খাটাচ্ছেন না আপনি?

চাকর আসিয়া বলিল—আসেন বাবুজি, আপনাদের চৌখা লাগানো হয়েছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—কোথায় রে?

—হল-ঘরের পাশের কামরামে।

—চলুন তবে স্যর, রাত অনেক হলো, খেয়ে আসা যাক্। তবে একটা কথা বলি। আপনি এদের অনেককে ভাঙিয়ে নিচ্ছেন, এদের ষ্টুডিওর লোকেরা যেন জানতে না পারে, আজ তো ওদেরই পার্টি—শচীনবাবুকে বলবেন কথাটা গোপন রাখতে।

—না, কে জানবে? শচীন খেতে গিয়েচে···এলেই ব'লে দেবো।

রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গদাধর দেখিলেন, এখন আর বাড়ী যাওয়া চলে না! গদিতে গিয়া অবশ্য শুইতে পারিতেন,

সেও এখন সম্ভব নয়। ভড়মশায় গদিতে রাত্রে থাকে···সে কি মনে করিবে ?

সুতরাং বাকি রাতটুকু অঘোরবাবুর সঙ্গে গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিতে হইবে।

অঘোরবাবুও দেখা গেল, গল্প পাইলে আর কিছুই চান না··· কিংবা হয়তো তাঁহারও বাড়ী ফিরিবার উপায় নাই এখন।

সকাল হইয়া গেল।

গদাধর বাগানের পুকুরে স্নান সারিয়া, চা-পান করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। ষ্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল শেষ রাত্রের দিকে সব চলিয়া গিয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—তবে আমি যাই স্যর, বাড়ী গিয়ে একটু ঘুমোবো।

—চলুন, আমিও যাবো। শচীনকে দেখচিনে, সে বোধহয় রাত্রে চলে গিয়েছে।

গদাধর বাগান-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু নিজের বাড়ী বা গদিতে না ফিরিয়া শোভারাণীর বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। শোভা সবে স্নান সারিয়া, চা পানের উদ্যোগ করিতেছে, গদাধরকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি কি মনে ক'রে? এত সকালে ?

গদাধর আগের মত লাজুক ও নিরীহ পল্লীগ্রামের গৃহস্থটি আর এখন নাই! মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

তিনি প্রথমেই শোভার কথার কোনো উত্তর না দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। কোনোদিকে কেহ নাই। তখন সুর নীচু করিয়া তিনি বলিলেন—আমায় দেখে রাগ করেচো, না খুশী হয়েচো শোভা?

মুখ ঘুরাইয়া শোভা বলিল—ওসব ধ্যানের কথা এখন থাক্। আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই হাতে—কোনো কাজ আছে?

গদাধর হাসি-হাসি মুখে বলিলেন—না, কোনো কাজ নয়, তোমায় দেখতে এলাম।

—হয়েচে, থাক্।

—রাগ কিসের?

—রাগের কথা তো বলিনি—সোজা কথাই বলচি।

এইসময় ভৃত্য শুধু শোভার জন্য চা ও খাবার আনিয়া, টিপয় আগাইয়া শোভার ঈজিচেয়ারের পাশে বসাইয়া দিল। শোভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—বাবুর কই?

—আপনি তো বললেন না, মাইজি!

—যতসব উল্লুক হয়েচো! বলতে হবে কি? দেখতে পাচ্চো না?

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিতে গেলেন—আহা, থাক্ থাক্ আমার না হয়—আমি আর এখন চা খাবো না শোভা।

শোভা নিস্পৃহকণ্ঠে বলিল—তবে থাক্। সত্যিই খাবেন না?

—না, না—আমি—এখন থাক্।

শোভা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজেই চা পান সুরু করিয়া দিল।

গদাধর গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—কাল সব কন্ট্রাক্ট্ হয়ে গেল শোভা। আমার অনুরোধ, তোমায় আমার কোম্পানিতে আসতে হবে—কাল রেখা আর সুষমা কন্ট্রাক্ট্ করলে।

শোভা চায়ে চুমুক দিতে যাইয়া, চায়ের পেয়ালা অর্দ্ধপথে ধরিয়া, গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোথায় হলো?

—কাল রাত্রে, ঘোষেদের বাগান-বাড়ীতে।

—অঘোরবাবু ছিল?

—হ্যাঁ, সেই-তো সব যোগাড় করচে।

শোভা আর কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে চা খাইয়া চলিল—উদাসীন, নিস্পৃহ ভাবে। কোনো বিষয়ে অযথা কৌতূহল দেখানো যেন তাহার স্বভাব নয়! চা শেষ করিয়া সে পাশের ঘরে কোথায় অল্পক্ষণের জন্য উঠিয়া গেল, যাইবার সময় গদাধরকে কিছু বলিয়াও গেল না। পুনরায় যখন ফিরিল, তখন হাতে দু'খানা গ্রামোফোনের রেকর্ড। একখানা গদাধরের হাতে দিতে-দিতে বলিল—এই দেখুন, আমার গান বেরিয়েচে, এইচ্, এম, ভি—কাল এনেচি।

গদাধর পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন—তাই-তো। বেশ ভালো গান?

—শুনবেন নাকি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা মন্দ কি। বাজাও না।

শোভা রেকর্ডখানা গদাধরের হাত হইতে লইয়া পাশের ঘরে বড়

ক্যাবিনেট্ গ্রামোফোনে চড়াইয়া দিয়া আসিল। গদাধর গানের বিশেষ-কিছু বোঝেন না, ভদ্রতার খাতিরে একমনে শুনিবার ভাণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রেকর্ড শেষ হইলে মুখে কৃত্রিম উৎসাহের ভাব আনিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, ভারি চমৎকার। ওখানাও দাও, শুনি।

শোভা কিন্তু নিজে একবারও জিজ্ঞাসা করিল না, গান কি-রকম হইয়াছে। বোধহয় গদাধরের নিন্দা বা সুখ্যাতির উপর সে কোনো আস্থা রাখে না। রেকর্ড বাজানো শেষ হইয়া গেল। শোভা একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। গদাধর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। এইবার বোধহয় শোভা উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, দশটা প্রায় বাজে। অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে বলিতে হইল—আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি।

—আসুন।

—আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো?

—কি কথা, বুঝলাম না।

—আমার ফিল্ম্ কোম্পানিতে কণ্ট্রাক্ট্ করার।

শোভা গম্ভীর মুখে বলিল—আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করুন, এ-কথা আমি আপনাকে বলচিনে। তবুও কণ্ট্রাক্ট্ করার আগে আমায় বললে পারতেন। আপনার টাকা গেল, তাতে আমার কিছুই নয়। আপনার টাকা আপনি খরচ করবেন, তাতে আমার কি বলবার থাকতে পারে! কিন্তু আপনি যে-কাজ জানেন না, সে-কাজে না নামাই আপনার

উচিত ছিল। অবিশ্যি আমি অমনি বললাম। আপনাকে বাধাও দিচ্চিনে, বা বারণও করচিনে। আপনার বিবেচনা আপনি করবেন।

—তোমার কি মনে হয়, এ-ব্যবসা লাভের হবে না?

—আমার কিছুই মনে হয় না। আমায় জড়াচ্চেন কেন এ-কথায়?

—না, বললে কিনা কথাটা, তাই বলচি।

—আমার যা মনে হয়, তা আপনাকে আমি বললাম। ফিল্ম্ কোম্পানি খুলে সকলে যে লাভবান হয়, লক্ষপতি হয়, তা নয় বলেই ধারণা। অঘোরবাবু অবিশ্যি দু-তিনটে ফিল্ম্ কোম্পানিতে ছিলেন, কাজ বোঝেন—তবে অনেষ্ট কিনা জানি না। আপনি করেন অন্য ব্যবসা, এর মধ্যে আপনি না নামলেই ভালো করতেন!

—তুমি বড় নিরুৎসাহ ক'রে দাও কেন লোককে! নামচি একটা শুভ কাজে—তুমি আসবে কিনা বলো।

—দোহাই আপনার গদাধরবাবু, আমি কিছু নিরুৎসাহ করিনি। আপনি দমবেন না। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমার আসা হবে না।

—এই উত্তর শোনবার জন্যে আজ সকালে তোমার এখানে এসেছিলাম আমি? মনে বড় কষ্ট দিলে শোভা। আমার বড় আশা ছিল, তোমাকে আমি পাবোই।

শোভা রাগের সুরে বলিল—আপনি পাটের ব্যবসা ক'রে

এসেছেন, অন্য ব্যবসার কথা আপনি কি বোঝেন যে যা-তা বলতে আসেন? প্রথম, আমি তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারিনে—এদের ষ্টুডিওতে আমার এখনও এক-বছর কণ্ট্রাক্ট্ রয়েছে। তা ছাড়া আমি একটা নিশ্চিত জিনিষ ছেড়ে, অনিশ্চিতের পেছনে ছুটবো, এত বোকা আমায় ঠাউরেচেন?

—আমার কোম্পানি অনিশ্চিত?

—তা না তো কি? আপনি ও-কাজ বোঝেন না। পরের হাতে খেলতে হবে আপনাকে। এক ব্যবসায় টাকা রোজগার ক'রে অন্য এক ব্যবসাতে ঢালচেন—কারো সঙ্গে পরামর্শ করেননি। ওতে আমার যেতে সাহস হয় না—এক কথায় বললাম।

—আচ্ছা, আমি যদি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতাম, কি পরামর্শ দিতে?

—সে-কথার দরকার নেই। কারো কথার মধ্যে আমি কখনো থাকি নে গদাধরবাবু, আমায় মাপ করবেন। বিশেষ ক'রে এর মধ্যে রেখা, সুষমা রয়েচে—ওরা সকলেই আমার বন্ধুলোক, এক ষ্টুডিওতে কাজ করেচি অনেক দিন। অঘোরবাবুকে আমি কাকাবাবু ব'লে ডাকি। উনিও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। অতএব আমি এ-কথার মধ্যে থাকবো না।

—তা হচ্চে না, আমার কথার উত্তর দাও—তুমি কি পরামর্শ দিতে?

শোভা ধমকের সুরে বলিল—ফের আবার ওই কথা! ওর উত্তর আমার কাছে নেই। আচ্ছা, আমাকে কেন আপনি এর মধ্যে জড়াতে

চান, বলতে পারেন ? আমি কারো কথায় কখনো থাকিনে। তবুও কখনো আমি আপনাকে এ পরামর্শ দিতাম না !

—দিতে না ?

—না। ব্যস, আপনি এখন আসুন। আমি এক্ষুণি উঠবো, অনেক কাজ আছে আমার।

গদাধর কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন।

ছয়

ইহার দুই দিন পরে ভড়মশায় গদিতে বসিয়া কাজ করিতেছেন, গদাধর বলিলেন—তেরো তারিখে একটা চেক্ ডিউ আছে ভড়মশায়, ছ'হাজার টাকা জমা দিতে হবে ব্যাঙ্কে।

ভড়মশায় মনিবের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—ছ'হাজার টাকা এই ক'দিনের মধ্যে ? টাকা তো মোকামে আটকে আছে—এখন অত টাকা এই ক'দিনের মধ্যে কোথায় পাওয়া যাবে বাবু ?

—তা হবে না। চেষ্টা দেখুন, পথ হাতড়ান।

—অত টাকার চেক্ কাকে দিলেন বাবু ?

অন্য কর্ম্মচারী হইলে মনিবকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না হয়তো—কিন্তু ভড়মশায় পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, ঘরের লোকের মত—তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র অধিকার। কথাটা এড়াইবার ভঙ্গিতে গদাধর বলিলেন—ও আছে একটা—ইয়ে—তাহ'লে কি করবেন বলুন তো ?

ভড়মশায় চিন্তিত-মুখে বলিলেন—দেখি, কি করতে পারি ! বুঝতে পারচিনে !

কিন্তু কয়দিন নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভড়মশায় বারো তারিখে মনিবকে কথাটা জানাইলেন। মোকামে টাকা আবদ্ধ আছে, এ-কদিনের মধ্যে কাঁচা মাল বেচিয়া টাকা যোগাড়

করা সম্ভব নয়। তিনটি মিলের পাটের মোটা অর্ডার কণ্ট্রাক্ট্ করা আছে, তিন মোকাম হইতে সেই অর্ডার-মাফিক পাট ক্রয় চলিতেছে—সে টাকা অন্য ক্ষেত্রে ঘুরাইয়া আনিতে গেলে, মিলে সময়মত পাট দেওয়া যায় না!

গদাধর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চেক্ ব্যাঙ্ক হইতে ফিরিয়া গেলে লজ্জার সীমা থাকিবে না। অবশ্য অন্য কোনো গদি হইতে টাকাটা ধার করা চলিত—কিন্তু তাহাতে মান থাকে না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর সেদিন রাত ন'টার পরে শোভার বাড়ী গেলেন। এদিকে ভড়মশায় চিন্তাকুল মুখে আছেন দেখিয়া খাইবার সময় অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে ভড়মশায়? মুখ ভার-ভার কেন?

—না, কিছু না।

—বলুন না কি হয়েচে—বাড়ীর সব ভালো তো?

—না, সে-সব কিছু না। একটা ব্যাপার ঘটেচে—আপনাকে না ব'লে থাকাও ঠিক না। বাবু কোথায় আগাম চেক্ দিয়েচেন মোটা টাকার। ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে নয়, তাহ'লে আমার অজানা থাকতো না। তাহ'লে উনি কোথায় এ-টাকা খরচ করবেন? কথাটা আপনাকে জানানো আমার দরকার। তবে আমি বলেচি, এ-কথা যেন বলবেন না বাবুকে!

অনঙ্গ চিন্তিত-মুখে বলিল—তাইতো ভড়মশায়, আমি কিছু ভাব-গতিক তো বুঝচি নে—মেয়েমানুষ কি করবো বলুন? কিন্তু ওঁর ভাব যে কত বদলেচে, সে আপনাকে কি বলি! বড় ভাবনায় পড়েচি

ভড়মশায়। আপনাকে বলবার একদিন পরে! উনি আজ-কাল রাতে প্রায়ই বাড়ী আসেন না। দোল-পুন্নিমের দিন দেখলেনই তো।

—হ্যাঁ, সে-কথা বাবুকে জিগ্যেস করেছিলেন?

—করেছিলাম। বললেন, ব্যবসার কাজ ছিল। আজকাল আমার ওপর রাগ-রাগ ভাব—সব সময় কথা বলতে সাহস পাইনে। উনি কেমন যেন বদলে গিয়েচেন—কখনো তো উনি এরকম ছিলেন না! এখন ভাবচি, আমাদের কলকাতায় না এলেই ভালো ছিল! বেশ ছিলাম দেশে। কালীঘাটের মা-কালীর কাছে মানত করেচি, জোড়া পাঁটা দিয়ে পূজো দেবো—ওঁর মতি-গতি যেন ভালো হয়ে ওঠে! বড় ভাবনায় আছি! আর কার কাছে কি বলবো বলুন, এখানে আমার কে আছে এক আপনি ছাড়া!

অনঙ্গ আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিল।

ভড়মশায় চিন্তিত-মুখে বলিলেন—তাইতো, আমাকে বললেন মা—ভালো হলো। এত কথা-তো আমি কিছুই জানতাম না। এখন বুঝতে পারচিনে কি করা যায়। আমারও তো যাবার সময় হলো।

অনঙ্গ বলিল—আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না ভড়মশায়। কলকাতায় আপনার যত অসুবিধাই হোক, ওঁকে এ-অবস্থায় ফেলে আপনি যেতে পাবেন না। আমার আর কেউ নেই ভড়মশায়—কে ওঁকে দেখে। এখানে ওই শচীন ঠাকুরপো হয়েচে ওঁর শনি। আর ওই নির্ম্মল—ওদের সঙ্গে

মিশেই এ-রকম হয়েচেন—আমাকে এ-আথান্তরে ফেলে আপনি চলে যাবেন না।

—আচ্ছা বৌ-ঠাকরুণ, এ-সব কথা আর কারো কাছে আপনি বলবেন না। আমি না হয় এখন দেশে না যাবো—আপনি কাঁদবেন না। চোখের জল মুছে ফেলুন—সতীলক্ষ্মী আপনি, হাতে ক'রে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেচি—মেয়ের মত দেখি। আপনাদের ফেলে গেলে ধর্ম্মে সইবে না। দেখি, কি হয়—অত ভাববেন না।

ভড়মশায় বিদায় লইলেন।

গদাধর শোভার বাড়ী গিয়া শুনিলেন, সে এইমাত্র ষ্টুডিও হইতে ফিরিয়া খাইতে বসিয়াছে। সুতরাং তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে শোভা ঘরে ঢুকিয়া একটা প্লেটে গোটাকয়েক সাজা পান গদাধরের সামনে টিপয়ে রাখিয়া, তাহা হইতে একটা পান তুলিয়া মুখে দিল। কোনো কথা বলিল না।

গদাধর বলিলেন—বোসো শোভা, তোমার কাছে একটা কাজে এসেছিলাম।

শোভা নিজের ইজিচেয়ারটাতে বসিয়া বলিল—কাজ কি, তা তো বুঝতে পেরেচি, তার উত্তরও দিয়েচি সেদিন।

—সে কাজ নয় শোভা। বড় বিপদে প'ড়ে এসেচি তোমার কাছে। একজনকে চেক দিয়েচি ছ'হাজার টাকার—কাল ব্যাঙ্কে চেক দাখিল ক'রে ভাঙাবার তারিখ—অথচ টাকা নেই ব্যাঙ্কে। কালই

ছ'হাজার টাকা বেলা দশটার সময় জমা দিতে হবে—অথচ আমার হাতে নেই টাকা! সব টাকা মোকামে আবদ্ধ। এখন কি করি—কাল মান যায়, তাই তোমার কাছে এসেচি।

শোভা বিস্ময়ের স্বরে বলিল—আমি কি করবো?

—টাকাটা এক মাসের জন্য ধার দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট্ দিচ্চি—মোকাম থেকে টাকা এলে শোধ ক'রে দেবো। এই উপকারটা করো আমার। বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেচি।

শোভা বলিল—আমি তো হ্যাণ্ডনোটের ব্যবসা করি নে—মহাজনী কারবারও নেই আমার। আমার কাছে এসেচেন টাকা ধার নিতে, বেশ মজার লোক তো আপনি! আপনার কলকাতায় বাড়ী আছে, মর্টগেজ রাখলে যে-কোনো জায়গা থেকে ধার পাবেন। ব্যাঙ্ক থেকেই তো ওভারড্রাফ্ট্ নিতে পাবেন!

গদাধর দুঃখিতভাবে বলিলেন—সে-সব করা তো চলে, কিন্তু তাতে বাজারে ক্রেডিট থাকে না ব্যবসাদারের। ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্ট্ নেওয়া চলবে না—বাড়ী বন্ধক দেওয়াও নয়। আছে অনঙ্গর গহনা—তা কি এখন বিক্রি করতে যাবো?

শোভা নিস্পৃহ ভাবে বলিল—কিন্তু আমি সেজন্যে দায়ী নই। আমার কাছে কেন এসেচেন? আপনার বোঝা উচিত ছিল আমার কাছে আসবার আগে, যে, আমি পোদ্দার নই, টাকা ধারের ব্যবসাও করিনে।

—তা হোক, তুমি দাও, ও-টাকাটা তোমার আছে খুবই। আমার বড় উপকার করা হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিল। শোভা কিছুতেই টাকা দিবে না, গদাধরও নাছোড়বান্দা। অবশেষে বহু অনুনয়-বিনয়ের পরে শোভা চার হাজার টাকা দিতে নিমরাজি-গোছের হইল—বাকি টাকা দিতে সে পারিবে না, স্পষ্ট বলিল—গদাধর অন্য যেখান হইতে পারেন, সে টাকা জোগাড় করুন।

গদাধর বলিলেন—তবে চেক্‌খানা লিখে ফেল—আমি হ্যাণ্ডনোট্ লিখি—সুদ কত লিখবো?

—সাড়ে-বারো পার্সেণ্ট।

—ওটা সাড়ে-নয় ক'রে নাও। তুমি তো আর সুদখোর মহাজন নও?—উপকার করবার জন্যে তো দিচ্চো—সুদের লোভে দিচ্চো না তো!

—টাকা ধার দিচ্চি যখন, তখন ন্যায্য সুদ নেবো না তো কি! উপকার করচি, কে আপনাকে বলেচে? কারো উপকার করার গরজ নেই আমার! সাড়ে-বারো পার্সেণ্টের কমে পারবো না। ওর চেয়েও বেশী সুদ অপরে নেয়।

গদাধর অগত্যা সেই হিসাবেই হ্যাণ্ডনোট্ লিখিয়া, চেক্ লইয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে অনঙ্গ স্বামীকে বলিল,—হ্যাঁগা, একটা কথা বলবো, শুন্‌বে?

—কি?

—তোমার টাকার দরকার হয়েচে বলচেন ভড়মশায়, কত টাকার দরকার?

—কেন?

—বলো না, কত টাকার?

—দু'হাজার টাকার—দেবে?

—আমার গহনা বাঁধা দাও—নয়তো বিক্রি করো। নয়তো আর টাকা কোথা থেকে পাবে! কিন্তু এত টাকা তোমার দরকার হলো কিসের?

—সে-কথা এখন বলবো না। তবে জেনে রাখো যে, ব্যবসার জন্যেই দরকার। ভড়মশায় জানেন না সে-কথা!

—দেখ, আমি মেয়েমানুষ—কিই-বা বুঝি? কিন্তু আমার মনে হয়, ভড়মশায়কে না জানিয়ে তুমি কোনো ব্যবসাতে নেমো না—অন্তত পরামর্শ কোরো তাঁর সঙ্গে। পাকা লোক—আর আমাদের বড় হিতৈষী—আমায় নাহয় নাই বললে, কিন্তু ওঁকে জানিও।

—এ নতুন ব্যবসা। ভড়মশায় সেকেলে লোক—উনি এর কিছুই বোঝেন না। থাক্, এখন কোনো পরামর্শ করবার সময় নেই কারো সঙ্গে—যথাসময়ে জানতে পারবে। তুমি এখন খেতে দেবে, না, বক্‌বক্ করবে?

ধমক খাইয়া অনঙ্গ আর কোনো কথা না বলিয়া স্বামীর ভাত বাড়িতে গেল। স্বামীর চোখে ভালোবাসার দৃষ্টি সে আর বহুদিন হইতেই দেখে না—আগে-আগে রাগের কথা বলিলেও স্বামীর চোখে

থাকিত প্রেম ও স্নেহের দৃষ্টি···এখন ভালো কথা বলিবার সময়েও সে দৃষ্টির হদিস্ পাওয়া যায় না। অনঙ্গ যেন স্বামীর মন হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। কেন এমন হইল, কিছুতেই সে ভাবিয়া পায় না।

পরের মাসে অবস্থা যেন আরও খারাপ হইয়া আসিল। গদাধর প্রায় শেষরাত্রের দিকে বাড়ী ফেরেন, অনঙ্গ সন্দেহ করিতে লাগিল। গদাধর মাঝে-মাঝে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফেরেন না। আসিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়েন, কারো সঙ্গে কথা বলেন না—বিছানা হইতে উঠিতে দশটা বাজিয়া যায়। গদির কাজও নিয়মমত দেখাশুনা করেন না। ভড়মশায় ইহা লইয়া দু-একবার বলিয়াও বিশেষ কোনো ফল লাভ করিলেন না।

শ্রাবণ মাসের দিকে হঠাৎ একদিন গদাধর ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাড়ী আসিয়া বলিলেন—আমি একবার বাইরে যাচ্চি, হয়তো কিছু দেরি হতে পারে ফিরতে—খরচপত্র গদি থেকে আনিয়ে নিও···ভড়মশায়কে বোলো, যদি কখনো কোনো দরকার হয়।

অনঙ্গ উৎকণ্ঠিত-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—কোথায় যাবে? ক'দিনের জন্যে—এমন হঠাৎ···

—আছে, আছে, দরকার আছে। দরকার না থাকলেই কি বলচি।

—তা তো বুঝলাম—কিন্তু বলতে দোষ কি, বলেই যাও না! তুমি আজকাল আমার কাছে কথা লুকোও—এতে আমার বড় কষ্ট

হয়। আমি তোমাকে কখনো বারণ করিনি বা বাধা দিইনি—তবে আমায় বললে দোষ কি ?

—হবে, সে পরে হবে। মেয়েমানুষের কাণে সব কথা তুলতে নেই।

অনঙ্গ স্বামীর মেজাজ বুঝিত। বেশি রাগারাগি করিলে তিনি রাগ করিয়া না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবেন। আজকালই যে এমন হইয়াছে তাহা নয়—চিরকাল অনঙ্গ এইরকম দেখিয়া আসিতেছে! তবে পূর্ব্বে অনঙ্গ ইহাতে তত ভয় পাইত না—এখন ভরসাহারা হইয়া পড়িয়াছে—স্বামীর উপর সে-জোর যেন সে ক্রমশঃ হারাইতেছে।

গদাধর একমাসের মধ্যে বাড়ী আসিলেন না, ভড়মশায়কে ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি দিতেন—তাহা হইতে জানা গেল, জয়ন্তী-পাহাড়ে ভোটান ঘাট নামক স্থানে তিনি আছেন। অনঙ্গ চিঠি দিল খুব শীঘ্র ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়া। গদাধর লিখিলেন, এখন তিনি কাজে ব্যস্ত, শেষ না করিয়া যাইতে পারিবেন না। অনঙ্গ কাঁদিয়া-কাটিয়া আকুল হইল।

একদিন পথে হঠাৎ শচীনের সঙ্গে ভড়মশায়ের দেখা। ভড়মশায় শচীনকে গদাধরের ব্যাপার সব বলিলেন।

শচীন বলিল—তা আপনারা এত ভাবচেন কেন? সে কোথায় গিয়েচে আমি জানি।

—কোথায় বলুন—বলতেই হবে। আপনার বৌদিদি ভেবে আকুল হয়েচেন—জানেন তো বলুন।

—আমার কাছে শুনেচেন, তা বলবেন না। সে তার কোম্পানির সঙ্গে শুটিংএ গিয়েচে জয়ন্তী-পাহাড়ে। পাহাড় ও বনের দৃশ্য তুলতে হবে—ভোটান ঘাটে শুটিং হচ্চে।

—সে কি, বুঝলাম না তো! শুটিং কি ব্যাপার?

—আরে, ফিল্ম্ তৈরী হচ্চে মশাই—ফিল্ম্ তৈরী হচ্চে। গদাধর ফিল্ম্ কোম্পানি খুলেচে—অনেক টাকা ঢেলেচে—নিজে আছে, আর একজন অংশীদার আছে। তাই ওরা গিয়েচে ওখানে—কিছু ভাববেন না। আমার কাছে শুনেচেন, বলবেন না কিন্তু।

ভড়মশায় শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। মনিব পাটের গদির ক্যাশ ভাঙিয়া ছবি তৈরীর ব্যবসায় লাগিয়াছেন, এ ভালো লক্ষণ নয়। সে নাকি যত নটী লইয়া কারবার, তাহাতে মানুষের চরিত্র ভালো থাকে না, থাকিতে পারে না কখনও! বৌ-ঠাকরুণ সতীলক্ষ্মী, এখন দেখা যাইতেছে, তাঁহার আশঙ্কা তবে নিতান্ত অমূলক নয়!

অনঙ্গকে তিনি এ-কথা কিছু জানাইলেন না।

আরও দুই মাস আড়াই মাস কাটিয়া গেল, গদাধর ফিরিলেন না, এদিকে একদিন গদির ঠিকানায় গদাধরের নামে এক পত্র আসিল। মনিবের নামের পত্র ভড়মশায় খুলিতেন—খুলিয়া দেখিলেন, শোভারাণী মিত্র বলিয়া কে একটি মেয়ে তাহার পাওনা চার হাজার টাকার জন্য কড়া তাগাদা দিয়াছে। ভড়মশায় বড়ই বিপদে পড়িলেন—কে এ মেয়েটি—মনিব তাহার নিকট এত টাকা ধার করিতেই-বা গেলেন কেন—এ-সব কথার কোনো মীমাংসাই ভড়মশায় করিতে

পারিলেন না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া ঠিক করিলেন, মেয়েটির সঙ্গে নিজেই একবার দেখা করিবেন।

চিঠিতে ঠিকানা লেখা ছিল, ভড়মশায় একদিন ভয়ে-ভয়ে গিয়া দরজায় কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়াই বলিল—ও, তুমি আড়তের লোক ?

ভড়মশায় বলিলেন—হ্যাঁ।

—মাইজি ওপরে আছেন, এসো।

ভড়মশায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না—এ চাকরটি কি করিয়া জানিল, তিনি আড়তের লোক ?

উপরে যে-ঘরে চাকরটি তাঁহাকে লইয়া গেল, সে ঘরে একটি সুন্দরী মেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্য-একটি মেয়ের সহিত গল্প করিতেছিল—দেখিয়া ভড়মশায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দরজা হইতে সরিয়া যাইতেছিলেন, মেয়েটি বলিল—কে ?

ভড়মশায় বিনয়ে ও সঙ্কোচে গলিয়া বলিলেন—এই—আমি—

চাকর পিছন হইতে বলিল—আড়তের লোক।

মেয়েটি বলিল—ও, আড়তের লোক ! তা তোমাকে ডেকেছিলাম কেন জানো—এবার ওরকম চাল দিয়েচো কেন ? ও চাল তুমি ফেরত নিয়ে যাও এবার—আর এক মণ কাটারিভোগ পাঠিয়ে দিও—এখনি—বুঝলে ?

ভড়মশায় ভয়ে-ভয়ে বলিলেন, তিনি চালের আড়ত হইতে আসেন নাই, গদাধর বসুর গদি হইতে আসিয়াছেন।

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—

তাই নাকি! ও, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। কিছু মনে করবেন না, বসুন আপনি। গদাধরবাবু এখন কোথায়?

—আজ্ঞে, তিনি ভোটান ঘাট···

—ও, শুটিং হচ্ছে শুনেছিলাম বটে। এখনও ফেরেননি?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, ঠিকানাটা দিয়ে যান আপনি। একটু চা খাবেন?

—আজ্ঞে না, মাপ করবেন মা লক্ষ্মী, আমি চা খাইনে।

—শুনুন, আপনি আমার চিঠিখানা পড়েচেন তাহ'লে? নইলে আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন? আমার পাওনা টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকদিন হলো। এক মাসের জন্যে নিয়ে আজ তিন মাস···

—আজ্ঞে, বাবু এলেই তিনি দিয়ে দেবেন। আপনি আর-কিছুদিন সময় দিন দয়া ক'রে।

—আচ্ছা, আপনি ভাববেন না। এলে যেন একবার উনি আসেন এখানে বলবেন তাঁকে।

ভড়মশায় অনেক-কিছু ভাবিতে-ভাবিতে গদিতে ফিরিলেন। কে এ মেয়েটি? হয়তো ভালো শ্রেণীর মেয়ে নয়, কিন্তু বেশ ভদ্র। যাহাই হউক, ইহার নিকট কর্ত্তা টাকা ধার করিতে গেলেন কেন, বৃদ্ধ তাহাও কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, বৌ-ঠাকরুণকে সব খুলিয়া বলিবেন—শেষে ঠিক করিলেন, বৌ-ঠাকরুণকে এখন কোনো কথা না বলাই ভালো হইবে। কি জানি, মনিব যদি শুনিয়া চটিয়া যান?

ইহার মাসখানেক পরে শোভারাণী একদিন হঠাৎ গদাধরকে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সকালবেলা। শোভারাণীর প্রাতঃস্নান এখনও সম্পন্ন হয় নাই। আলুথালু চুল, ফিকে নীল রংয়ের সিল্কের শাড়ী পরনে, হাতে ভোরের খবরের কাগজ। শোভা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গদাধর বলিলেন—এই যে, ভালো আছো শোভা? এই ট্রেণ থেকে নেমেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। এখনও বাড়ী যাইনি।

—আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উত্তর দিতুম, কিন্তু চলে আসবো কলকাতায়, ভাবলুম, আর চিঠি দিয়ে কি হবে, দেখাই তো করবো।

—আমার টাকার কি ব্যবস্থা করলেন?

—টাকার ব্যবস্থা হয়েই রয়েচে। ছবি তোলা হয়ে গেল—এখন চালু হলেই টাকা হাতে আসবে।

—তার আগে নয়?

—তার আগে কোথা থেকে হবে বলো? সবই তো বোঝো। কলকাতার বাড়ীও মর্টগেজ দিতে হয়েচে বাকী বারো হাজার টাকা তুলতে। এখন সব সার্থক হয়, যদি ছবি ভালো বিক্রি হয়!

—ওসব আমি কি জানি? বেশ লোক দেখছি আপনি! কবে আমার টাকা দেবেন, ঠিক ব'লে যান।

—আর দুটো মাস অপেক্ষা করো। তোমার এখন তাড়াতাড়ি টাকার দরকার কি? সুদ আসচে আসুক না! এও তো ব্যবসা।

শোভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—বেশ মজার কথা বললেন যে! আমার সুদের ব্যবসাতে দরকার নেই। টাকা কবে দেবেন, বলুন? তখন তো বলেননি এত কথা—টাকা নেবার সময় বলেছিলেন, এক মাসের জন্যে!

গদাধর মিনতির সুরে বলিলেন—কিছু মনে করো না শোভা। এসময় যে কি সময় আমার, বুঝে ছাখো। ক্যাশে টাকা নেই গদিতে। মিলের নতুন অর্ডার আর নিইনি—এখন পুঁজি যা-কিছু, সব এতে ফেলেচি।

—কতদিনের মধ্যে দেবেন? দু'মাস দেরি করতে পারবো না।

—আচ্ছা, একটা মাস। এই কথা রইলো! এখন তবে আসি। এই কথাটা বলতেই আসা।

—বেশ, আসুন।

দুই মাস ছাড়িয়া তিন মাস হইয়া গেল।

গদাধর বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন। ডিষ্ট্রিবিউটার ছবি তৈরী করিতে অগ্রিম অনেকগুলি টাকা দিয়াছে, ছবি বিক্রির প্রথম দিকের টাকাটা তাহারাই লইতে লাগিল। ছবি ভাড়া দেওয়া বা বিক্রয় করার ভার তাহাদের হাতে, টাকা আসিলে আগে তাহারা নিজেদের প্রাপ্য কাটিয়া লয়—গদাধরের হাতে এক পয়সাও আসিল না এই তিন মাসের মধ্যে। অথচ পাওনাদাররা দুবেলা তাগাদা সুরু করিল। যে-পরিমাণে তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় তাহারা প্রদর্শন করিতে লাগিল টাকার তাগিদ দিতে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ উৎসাহ ও

অধ্যবসায় দেখাইয়া মারকোনি বেতার-বার্ত্তা পাঠাইবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বা প্রখ্যাতনামা বার্ণার্ড পেলিসি এনামেল করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ অমানুষিক অধ্যবসায় দেখাইয়াও কোনো ফল হইল না—গদাধর কাহাকেও টাকা দিতে পারিলেন না।

ছবি বাজারে চলিল না, কাগজে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে লাগিল—তবুও গোলা-দর্শকরা মাস-দুই ধরিয়া বিভিন্ন মফঃস্বলের সহরে ছবিখানা দেখিল। কিন্তু ডিষ্ট্রিবিউটারের অগ্রিম-দেওয়া টাকা শোধ করিতেই সে টাকা ব্যয় হইল—গদাধরের হাতে যাহা পড়িল—তাহার অনেক বেশি তিনি ঘর হইতে বাহির করিয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া গদাধর পাইলেন সাত হাজার টাকা। তেইশ হাজার টাকা লোকসান।

ইতিমধ্যে আরও মুস্কিল হইল।

পুনরায় একখানা ছবি তোলা হইবে বলিয়া আর্টিষ্টদের সঙ্গে, যে-বাগান-বাড়ী ভাড়া লইয়া ষ্টুডিও খোলা হইয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে এবং মেসিন-বিক্রেতাদের সঙ্গে এক বৎসরের কণ্ট্রাক্ট্ করা হইয়াছিল—ছবি তুলিবার দেরি হইতেছে দেখিয়া তাহারা চুক্তিমত টাকার তাগাদা সুরু করিল। কেহ-কেহ অন্যথায় নালিশ করিবার ভয়ও দেখাইল।

গদাধর যে সাত হাজার টাকা পাইয়াছিলেন—তাহার অনেক টাকাই গেল এই দলের মধ্যে কিছু-কিছু করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপাততঃ শান্ত করিতে। শোভার টাকা শোধ দেওয়ার

কোনো পন্থাই হইল না। বাজারেও এখনও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দেনা।

অঘোরবাবু উপদেশ দিলেন, ইহার একমাত্র প্রতিকার নতুন এক-খানা ছবি তৈরি করা। আরও টাকা চাই—গদাধর ডিষ্ট্রিবিউটারদের সঙ্গে কথা চালাইলেন। তাহারা এ ছবিতে বিশেষ লোকসান খায় নাই, নিজেদের টাকা প্রায় সব উঠাইয়া লইয়াছিল—তাহারা বাকী ত্রিশ হাজার টাকা দিতে রাজি হইল—কিন্তু গদাধরকে ত্রিশ হাজার বাহির করিতেই হইবে। ষাট হাজার টাকার কমে ছবি হইবে না।

অঘোরবাবু উৎসাহ দিলেন, ছবি করিতেই হইবে। দু'একখানা ছবি অমন হইয়া থাকে।

সাত

সামনের হপ্তাতেই কাজ আরম্ভ করা দরকার—কিছু টাকা চাই। গদাধর ভড়মশায়কে বলিলেন—ক্যাশে কত টাকা আছে?

—হাজার-পনেরো!

—আর, মোকামে?

—প্রায় সাত হাজার।

—ক্যাশের টাকাটা আমাকে দিতে হবে। আপনি বন্দোবস্ত করুন—দু'চার দিনের মধ্যে দরকার!

ভড়মশায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ক্যাশের টাকা দিলে মিলের অর্ডারী মাল কিনবো কি দিয়ে বাবু? ক্যাশের টাকা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। মিলওয়ালাদের দু'হাজার গাঁটের অর্ডার নেওয়া হয়েছে—মোকামে অত মাল নেই। নগদ কিনতে হবে। এদিকে মহাজনের ঘরে আর-বছরের দেনা শোধ হয়নি—তাদেরও কিছু দিতে হবে।

—হাজার-পাঁচেক রেখে, হাজার-দশেক দিন আমায়।

ভড়মশায় আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে-মনে প্রমাদ গণিলেন। ক্যাশের টাকা ভাঙিয়া বাবু কি সেই ছবি তোলার ব্যবসায়ে ফেলিবেন? এবার যে ছবি তোলা হইল, তাহাতে যদি লাভ হইত, তবে পুনরায় টাকার দরকার হইবে কেন বাবুর? এ কি-রকম ব্যবসা? ভড়মশায় গিয়া অনঙ্গকে সব খুলিয়া বলিলেন।

অনঙ্গ কাঁদিয়া বলিল—কি হবে ভড়মশায়? তাও যায় যাক—আমরা দেশে ফিরে নুন-ভাত খেয়ে থাকবো। আপনি ওঁকে ফেরান।

সেদিন অনঙ্গ স্বামীকে বলিল—ছাখো, একটা কথা বলি। আমি কোনো কথা এতদিন বলিনি, বা তুমিও আমার কাছে কিছু বলোনি। কিন্তু শুনলুম, তুমি টাকা নিয়ে ছবি তৈরির ব্যবসা করচো—তাতে লোকসান খেয়েও আবার তাই করতে চাইচো! এ-সব কি ভালো?

গদাধর বলিলেন—তুমি বুঝতে পারচো না অনঙ্গ। এ-সব কথা তোমায় বলেছে ওই বুড়োটা—না? ও এ-সবের কি বোঝে যে, এর মধ্যে কথা বলতে যায়! ছবিতে লোকসান হয়েছে সত্যি কথা—কিন্তু আর-একখানা দিয়ে আগের লোকসান উঠিয়ে আনবো! ব্যবসার এই মজা। ব্যবসাদার যে হবে, তার দিল চাই খুব বড়—সাহস চাই খুব। পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে ব্যবসায় বড় হওয়া যায় না অনঙ্গ…হারি বা জিতি! আমার কি বুদ্ধি নেই ভাবচো? সব বুঝি আমি। এ-সবের মধ্যে তুমি মেয়েমানুষ, থাকতে যেয়ো না।

—বোঝো যদি, তবে লোকসান খেলে কেন?

—হার-জিৎ সব কাজেরই আছে, তাতে কি? বলেচি তো তুমি এ-সব বুঝবে না।

অনঙ্গ চোখের জল ফেলিয়া বলিল—আমাদের মেলা টাকার দরকার নেই—চলো, আমরা দেশে ফিরে যাই। বেশ ছিলাম সেখানে—এখানে এসে অনেক টাকা হয়ে আমাদের কি হবে?

সারাদিনের মধ্যে তোমার একবার দেখা পাইনে, সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকো—দুটো খেতে আসবার সময় পর্য্যন্ত পাও না! সেখানে থাকলে তবুও দু'-বেলা দেখতে পেতাম তোমাকে—আমার মন যে কি হু-হু-করে, সে-কথা···

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অত ঘরবোলা হয়ে ছিলুম বলেই সেখানে ব্যবসাতে উন্নতি করতে পারিনি অনঙ্গ। ও ছিল গেরস্ত আড়তদারের ব্যবসা। দিন কেনা, দিন বেচা—লোকসানও নেই, লাভও বেশী নেই। ওতে বড়মানুষ হওয়া যায় না।

—বড়মানুষ হয়ে আমাদের দরকার নেই। লক্ষ্মীটি—চলো, গাঁয়ে ফিরে যাই। আমরা কি কিছু কম সুখে ছিলাম সেখানে, না, খেতে পাচ্ছিলাম না?

গদাধর এইবার স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন—কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়—চুপ করিয়া রহিলেন।

অনঙ্গ বলিল—ওগো, আমায় একবার দেশে নিয়ে চলো না—এক-দিনের জন্যে।

—কেন? গিয়ে কি হবে এখন?

—দশঘরার বন-বিবির থানে পূজো মানত ছিল—দিয়ে আসবো।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অর্থাৎ তোমার পূজো মানত আরম্ভ হয়ে গিয়েচে এরি মধ্যে?

—সে জন্যে না! তুমি অমত কোরো না···লক্ষ্মীটি···সামনের মঙ্গলবার চলো দেশে যাই—দু'দিন থাকবো মোটে।

—পাগল! এখন আমার সময় নেই। ওসব এখন থাকগে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গদাধর শোভারাণীর বাড়ী গেলেন—ফোন্ করিয়া পূর্ব্বেই যাইবার কথা বলিয়াছিলেন।

শোভা বলিল—কি খবর ?

—অনেক কথা আছে। খুব বিপদে প'ড়ে এসেচি তোমার কাছে। তুমি যদি অভয় দাও···

—অত ভণিতে শোনবার সময় নেই আমার। কি হয়েচে বলুন না !

গদাধর নিজের অবস্থা সব খুলিয়া বলিলেন। কিছু টাকার দরকার এখনই। কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না ?

বলিলেন—একটা কিচ্ছু করতেই হবে শোভা। বড় বিপদে প'ড়ে গিয়েছি। আর একটা অনুরোধ আমার, এ-ছবিতে তোমাকে নামতে হবে, না নামলে ছবি চলবে না। তোমার টাকা আমি দেবো, আমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করো—যা তোমার দাম দর হবে, তা থেকে কিছু কমাবো না।

শোভা সব শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। কোনো কথা বলিল না।

—কি ? একটা যা হয় বলো আমায়।

—কি বলবো, বলুন ? ছবি মার খেয়ে যাবে আমি আগেই জানতাম।

—সে তো বুঝলুম। যা হবার হয়েচে—এখন আমায় বাঁচাও !

—আমি কি করতে পারি যে আমার কাছে এসেচেন ?

—আরও কিছু টাকা দাও, আর এ-ছবিতে নামো।

—কোনোটাই হবে না আমার দ্বারা। আমায় এত বোকা পেয়েছেন ?

—কেন হবে না শোভা ? আমায় উদ্ধার করো। প্রথম ছবি—তেমনি হয়নি হয়তো। সে-ছবি থেকে অনেক কিছু বুঝে নিয়েছি—আর একটি বার···

শোভা এবার রাগ করিল। গলার স্বর তাহার কখনো বিশেষ চড়ে না, একটু চড়িলেই বুঝিতে হইবে, সে রাগ করিয়াছে। সে চড়া-গলায় বলিল—আমার টাকা ফেলে দিন, মিটে গেল—আমি উদ্ধার করবার কে ? আমার কথা শুনেছিলেন আপনি ? আমি বলিনি যে ফিল্ম্ কোম্পানি চালানো আপনার কর্ম্ম নয় ? আপনি যার কিছু বোঝেন না, তার মধ্যে···

গদাধর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারও গলায় রাগের স্বর আসিয়া গেল। হয়তো রাগের সঙ্গে দুঃখ মেশানো ছিল।

বলিলেন—বেশ, তুমি দিও না টাকা! না দিলেই-বা কি করতে পারি আমি ? তবে আমি ছবি একখানা করবোই। দেখি অন্য জায়গায় চেষ্টা।—আচ্ছা, আসি তাহ'লে।

গদাধর বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইবেন—শোভা ডাকিয়া বলিল—বারে, চলে গেলেই হলো ? শুনে যান—আমার টাকার একটা ব্যবস্থা করুন।

—হবে, হবে, শীগ্‌গির হবে।

—শুনুন, শুনুন !

—কি ?

—কোম্পানি করবেনই তবে? আপনার সর্ব্বনাশ হোলেও শুনবেন না?

গদাধর বোধহয় খুব চটিয়া গিয়াছিলেন। সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া নামিতে-নামিতে বলিলেন—না, সে তো বলেচি অনেকবার। কতবার আর বলবো? ও আমি না বুঝে করতে যাচ্চিনে। আমায় কারো শেখাতে হবে না।

গদাধর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শোভা অন্যমনস্ক হইয়া কতক্ষণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে এমন এক-ধরণের মানুষ দেখিল, যাহা সে সচরাচর দেখে না! অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া সে ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিল।

একটু পরে শচীন একখানা বড় মোটর-ভর্ত্তি বন্ধুবান্ধব লইয়া হাজির হইল। সকলে কোলাহল করিতে-করিতে উপরে উঠিয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে একজনকে শোভা চেনে—উড়িষ্যার কোনো এক দেশীয়-রাজ্যের রাজকুমার, পূর্ব্বে একদিন শোভাদের ষ্টুডিও দেখিতে গিয়াছিলেন। পৈতৃক অর্থ উড়াইবার তীর্থস্থান কলিকাতা ধামে গত পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে কুমার-বাহাদুর প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা অন্তরীক্ষে অদৃশ্য করিয়া দিয়া স্বীয় দরাজ-হাতের ও রাজোচিত-মনের পরিচয় দিয়াছেন!

কুমার-বাহাদুর আগাইয়া আসিয়া পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন—নমস্কার, মিস্ মিত্র, কেমন আছেন? এলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

শোভা নিস্পৃহভাবে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালো আছি!

শচীন পিছন হইতে বলিল—কুমার-বাহাদুর এসেছিলেন তোমায় নিয়ে যেতে—উনি মস্ত বড় পার্টি দিচ্চেন কাসানোভায়—আজ সাতটা থেকে। এখন একবার সবাই মিলে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের···

শোভা বলিল—আমার শরীর ভালো নয়।

কুমার-বাহাদুর বেশ সুপুরুষ, তরুণবয়স্ক, সাহেবী পোশাক-পরা, কেতাকায়দা-দুরস্ত। সাহেবিয়ানাকে যতদূর নকল করা সম্ভব একজন অর্দ্ধশিক্ষিত দেশী লোকের পক্ষে—তাহার ত্রুটি তিনি রাখেন নাই। অসুখের কথা শোভার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি তটস্থ হইয়া বলিলেন—আপনার অসুখ হয়েচে, মিস্ মিত্র? গাড়ীতে ক'রে যেতে পারবেন না?

শোভা বিরক্তির সুরে বলিল—আজ্ঞে না, মাপ করবেন।

শচীন দলবল লইয়া অগত্যা বিদায় হইল।

দিন-দুই পরে শোভা নিজের স্টুডিওতে হঠাৎ গদাধর ও রেখাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। প্রথমে তাহার মনে হইল, তাহারই জন্য উহারা আসিয়াছে। শেষে দেখিল, তাহা নয়, অন্য কি-একটা কাজে আসিয়া থাকিবে—অন্য কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাছে। শোভা সেটে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে সাজগোজ করিয়াছে, মাথায় মুকুট, হাতে সেকেলে তাড়, বালা, চূড়—বাহুতে

নিমফল-ঝোলানো রাংতার গিল্টি-করা বাজু—পৌরাণিক চিত্রের ব্যাপার। তবুও সে একজন ছোকরা চাকরকে বলিল—এই, ওই বাবু আর মাইজিকে ডেকে নিয়ে আয় তো!

তাহার বুকের মধ্যে একটি অনুভূতি, যাহা শোভা কখনো অনুভব করে নাই পূর্ব্বে! রেখাকে গদাধরের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়াই কি এরূপ হইল? সম্ভব নয়। উহারা যাহা খুশি করিতে পারে, তাহার তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। তবে লোকটির মধ্যে তেজ আছে, সাহস আছে—বেশির ভাগ পুরুষই তাহার কাছে আসিয়া কেমন যেন হইয়া যায়, মেরুদণ্ডবিহীন মোমের পুতুলদের দুদণ্ড নাচানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই, জয়ের গর্ব্ব সেখানে বড়ই ক্ষণস্থায়ী। শাণিত ছোরার আগার সাহায্যে কচুগাছের ডগা কাটা! ছোরার অপমান হয় না তাতে?

গদাধরবাবুর কাছে গিয়া চাকরটি কি বলিল, গদাধরকে আঙুল দিয়া তাহার দিকে দেখাইল চাকরটা—এ-পর্য্যন্ত শোভা দেখিল। তাহার বুকের মধ্যে ভীষণ ঢিপ-ঢিপ সুরু হইল অকস্মাৎ—বুকের রক্ত যেন চলকাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। ঠিক সেইসময় ডাক পড়িল—গদাধরের সঙ্গে শোভার আর দেখা হইল না সেদিন।

মাস পাঁচ-ছয় কাটিল। পুনরায় পূজা আসিল, চলিয়াও গেল। কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন শচীন কথায়-কথায় বলিল—শুনেচো, গদাধর আমাদের বড় বিপদে পড়েচে।

শোভা জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে?

—ওর সেই ছবি অর্দ্ধেক হয়ে আর হলো না—কতকগুলো টাকা নষ্ট হলো। এবার একেবারে মারা পড়বে।

—কেন, কি হলো ?

—রেখা ঝগড়া ক'রে ছেড়ে দিয়েচে। তার সঙ্গে নাকি কোনো লেখাপড়া ছিল না এবার। সে সুবিধে পেয়ে গেছে—এখন নাকি শুনচি, রেখা বিয়ে করবে কাকে, সব ঠিক হয়ে গিয়েচে। যাকে বিয়ে করবে, রেখাকে সে ছবিতে নামতে দেবে না—নানা গোলমাল। রেখা চলে গেলে তার সঙ্গে সুষমাও চলে আসবে। ডিষ্ট্রিবিউটার অনেক টাকা ঢেলেচে—তারা নালিশ করবে গদাধরের নামে, বেচারী এবার একেবারে মারা যাবে তাহ'লে—বাজার সুদ্ধ দেনা।

শোভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—গদাধরবাবু এখন কোথায় ?

—সেই বাড়ীতেই আছে। তবে শুনচি নাকি, বাড়ী বন্ধক। বাড়ী থাকবে না, যতদূর মনে হচ্চে !

—ও !

—বড্ড চাল বাড়িয়েছিল, এবার একেবারে ধনে-প্রাণে গেল। মানে, তুই ছিলি বাবু, পাটের আড়তদার, করতে গেলি ফিল্মের ব্যবসা, যাকে যা না সাজে—বোকা পেয়ে পাঁচজনে মাথায় হাত বুলিয়ে—বুঝলে ?

শোভা একটু অন্যমনস্ক হইয়া অন্যদিকে চাহিয়াছিল, শচীনের শেষদিকের কথার মধ্যে কতকটা মজা দেখিবার উল্লাসের সুর ধ্বনিত হওয়ায় সে হঠাৎ ঝাঁঝিয়া উঠিয়া তীব্র বিরক্তির সুরে বলিল—আ—

আঃ,—কেন মিছিমিছি বাজে বকচেন একজনের নামে? আপনার গাঁয়ের লোক, আত্মীয় না? এত আমোদ কিসের তবে?

শচীনের কণ্ঠ হইতে আমোদের সুর এক মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল, সে শোভার দিকে চাহিয়া বলিল—না, তাই বলচি, তাই বলচি—লোকটার মধ্যে যে কেবল নিছক বেকুবি···

—আবার ওইসব কথা! লোকটার মধ্যে যাই থাকুক, সে-সব আলোচনা এখানে করবার কোনো দরকার নেই।

শোভার গলার সুরে রাগ বেশ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

ইহার পর শচীন এ-সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতে আর সাহস করিল না—কিন্তু সে আশ্চর্য্য হইল মনে-মনে। সে জানিত, শোভা একগাদা টাকা ধার দিয়াছে গদাধরকে, সে-ধারের একটা পয়সা এখনও সে পায় নাই···!

তাহাদের ষ্টুডিওর সঙ্গে টেক্কা দিয়া গদাধর ছবি তুলিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছে—বিশেষতঃ রেখার পূর্ব্ব-ইতিহাস যাহাই হউক, এখন যে অভিনয়ক্ষেত্রে সে শোভার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিতেছে দিন-দিন—এ-সব বিবেচনা করিয়া দেখিলে গদাধরের দুর্দ্দশা তো পরম উপভোগ্য বস্তু—নিতান্ত মুখরোচক গল্পের উপকরণ।

কি জানি, মেয়েমানুষের মেজাজ যে কখন কি, শচীন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা আজও বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরো ভীষণ অবাক হইয়া গেল সে, দিনকতক পরে একটি কথা শুনিয়া।

একদিন তাহাদের ষ্টুডিওর একটি মেয়ে, শোভার বিশেষ বন্ধু, শচীনকে ডাকিয়া বলিল—শুনুন, আপনাকে একটি কথা বলি।

—এই যে অলকা দেবী—ভালো তো? কি কথা?

—কথাটা খুব গোপনে রাখবেন কিন্তু। আপনি শোভাকে জানেন অনেকদিন থেকে, তাই আপনার কাছে বলচি, যদি আপনার দ্বারা কিছু কাজ হয়।

শচীন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—শোভার সম্বন্ধে কথা? আমায় দিয়ে কি উপকার—বুঝতে পারচিনে।

—শোভা এ ষ্টুডিও ছেড়ে ভারতী ফিল্ম্ কোম্পানিতে ঢোকবার চেষ্টা করচে—জানেন না? সেখানে চিঠি লিখেচে।

শচীন মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাসের স্বরে বলিল—'ভারতী ফিল্ম্ কোম্পানি'? সে তো আমাদের গদাধরের।

—সে-সব জানিনে মশাই, ওই যে যাদের 'ওলট-পালট' ব'লে ছবিটি একেবারে মার খেয়ে গেল।

—বুঝেচি, জানি—তারপর? সেখানে যেতে চাইচে শোভা?

—যেতে চাইচে মানে, চিঠি লিখেচে···দরখাস্ত করেচে···যাকে বলে মশাই—যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেচে!

—তার মানে?

—আমি কিছু বুঝতে পারচিনে। সেইজন্যেই আপনার কাছে বলা।

—এখানে ডিরেক্টরের সঙ্গে ঝগড়া হলো নাকি?

—সে-সব না। ওর সঙ্গে আবার ঝগড়া হবে কার? আমি কিছু বুঝচিনে। ভারতী ফিল্ম্ কোম্পানি একটা ফিল্ম বার ক'রে যা নাম কিনেচে—তাতে ওদের ছবি বাজারে চলবে না! যতদূর আমি জানি, ওদের পয়সা-কড়িরও তেমন জোর নেই—ওখানে শোভা কেন যেতে চাইচে, এ আমার মাথায় আসে না কিছুতেই।

—আপনি বুঝিয়ে ব'লে দেখুন না, অলকা দেবী?

—আমি কি না বুঝিয়েচি? অনেক বারণ করেচি। ওর ব্যাপার জানেন তো? যখন যা গোঁ ধরবে, তা না ক'রে ছাড়বে না! খেয়ালী-মেজাজের মেয়ে—এখানে ওর কণ্ট্রাক্ট রয়েচে এক বছরের। এরা নালিশ ক'রে দেবে, তখন কি হবে?

—সে তো জানি।

—আবার বুঝে-স্থঝে চলতেও ওর জোড়া নেই! যেখানে, যখন বুঝতে চাইবে সেখানে অঙ্ক কষবে—অথচ কেন অবুঝ হলো এমন যে···

—হুঁ।

—আপনি একবার বুঝিয়ে বলুন না শচীনবাবু। আমার মনে হয়···

—আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়।

শচীন মুখে বলিল বটে, কিন্তু সে সাহস করিয়া শোভার কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিল না—আজ কাল করিয়া প্রায় দিন-পনেরো কাটিল। শোভা কিন্তু ষ্টুডিও ছাড়িয়া কোথাও গেল না।

দিনের পর দিন রীতিমত চাকুরি করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু শচীন লক্ষ্য করিল, শোভার মুখ ভার-ভার, সে কোনোখানেই তেমন মেলামেশা করে না লোকের সঙ্গে, তবু আগে যাহাও একটু-আধটু করিত, এখন একেবারেই তা করে না। নিজের গাড়ীতে ষ্টুডিওতে ঢোকে, কাজ শেষ করিয়া গাড়ীতেই বাহির হইয়া যায়।

সেদিন তাহার সঙ্গে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল অলকার। গাড়ীতে উঠিতে যাইবে শোভা, সামনে অলকাকে দেখিয়া সে একটু অপেক্ষা করিল।

অলকা বলিল—কি, আজকাল যে বড় ব্যস্ত, কেমন আছো শোভা ?

—ভালোই আছি। তুই যাসনে কেন আমার ওখানে ?

—একটু ব্যস্ত ছিলাম ভাই—যাবো শীগ্‌গির একদিন। যাক্‌, আর ক'দিন আছো আমাদের এখানে ?

শোভা হাসিয়া বলিল—বরাবর আছি। ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে।

অলকা খুশী হইয়া বলিল—নেমেচে ? সত্যি নেমেচে ভাই ?

—নেমেচে। আচ্ছা, চলি তবে।

শচীন অলকার মুখে সংবাদটা শুনিয়া নিতান্তই খুশী হইয়া উঠিল। সেইদিনই সে শোভার ওখানে গেল। মনের উল্লাস চাপিতে না পারিয়া কথায়-কথায় বলিল—তারপর, একটা কথা আজ অলকা গুপ্তার মুখে শুনে বড় আনন্দ হলো শোভা।

—কি কথা ? কার সম্বন্ধে ?

—তোমার সম্বন্ধেই।

শোভা বিস্ময়ের স্বরে বলিল—আমার সম্বন্ধে? কি কথা, শুনি?

—যদিও আমি জানিনে তুমি কেন ঝোঁক ধরেছিলে, ভারতী ফিল্মে যাবার জন্যে—তবুও শুনে সুখী হলাম যে, সে ভূত তোমার ঘাড় থেকে নেমে গিয়েচে।

শোভা গম্ভীরমুখে বলিল—ভূত নামেনি—নামিয়ে গিয়েচে—জানেন?

শচীন বুঝিতে না পারার ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিল—মানে?

—মানে, এই দেখুন চিঠি।

শোভা শচীনের হাতে যে চিঠিখানা দিল, সেখানা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত —টাইপ-করা ইংরেজী চিঠি। তাহাতে 'ভারতী ফিল্ম্ ষ্টুডিও'র কর্ত্তৃপক্ষ দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছেন যে শোভারাণী মিত্রকে বর্ত্তমানে তাঁহাদের ষ্টুডিওতে লওয়া সম্ভব হইবে না!

শচীন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ফিল্ম্-গগনের অত্যুজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে তারকা মিস্ শোভারাণী মিত্র দীনভাবে চিঠি লিখিয়া চাকুরি প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল ভারতী ফিল্ম্ কোম্পানির মত তৃতীয়শ্রেণীর চিত্র প্রতিষ্ঠানে, আর তাহারা কিনা···

ব্যাপারটা শচীন ধারণা করিতেই পারিল না। শোভারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। তাহার মনে হইল, শোভা এ-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক।

তবুও এ এমনই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যাহা মন হইতে যাইতে চায় না।

শচীন বাসায় ফিরিবার পথে কতবার জিনিসটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিল। শোভার মত তেজী মেয়ে, সচ্ছল অবস্থার অভিনেত্রী রূপসী তরুণী—কি বুঝিয়া কিসের জন্য এ হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করিতে গেল? কোনো মানে হয় ইহার? যাহার পায়ের ধূলা পাইলে ভারতী ষ্টুডিওর মত কতশত ছবি-তোলা কোম্পানি কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইত—তাহাকে কিনা চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিল, এখানে তোমাকে চাকুরি দেওয়া সম্ভব হইবে না!

সাহস করিয়া ষ্টুডিওর বন্ধুবান্ধবের কাছেও এমন মজার কথাটা শচীন বলিতে সাহস করিল না। শোভার কাণে উঠিলে সে চটিবে।

ভড়মশায় পাটের কাজ ভালো ভাবেই চালাইতেছিলেন। আড়তের ক্যাশ হইতে মাসে-মাসে টাকা যদি তুলিয়া না লওয়া হইত, তবে ভড়মশায়ের সুনিপুণ পরিচালনায় আড়তের কোনোই ক্ষতি হইত না। কিন্তু গদাধর বারবার টাকা তুলিয়া আড়তের খাতা শুধু হাওলাতী-হিসাবে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন। কাজে মন্দা দেখা দিল।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম। নতুন পাট কিনিবার মরসুমে পাঁচ ছ'হাজার টাকা বিভিন্ন মোকামে ছড়ানো ছিল—এইবার সেখান হইতে মাল আনিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এইসময় ভড়মশায় একটা মোটা অর্ডার পাইলেন মিল হইতে —মাল যোগান দিতে পারিলে দু'পয়সা লাভ হইবে—কিন্তু টাকা নাই। ভড়মশায় নানাদিকে বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে অনঙ্গর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। গত চার পাঁচ মাস তিনি অনঙ্গকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনো কাজ করেন না। অনঙ্গ যে এত ভালো ব্যবসা বোঝে, ভড়মশায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বৌ-ঠাকরুণের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অনঙ্গ শুনিয়া বলিল—ব্যাঙ্ক থেকে কিছু নেওয়া চলবে না ?

—তা হবে না বৌ-ঠাকরুণ, অনেক নেওয়া আছে, আর দেবে না।

—মোকাম থেকে পাট আনিয়ে নিন, আর আমার গহনা যা আছে বিক্রি করুন !

—তোমার যা গহনা এখনও আছে, বৌ-ঠাকরুণ, তাতে আর আমি হাত দিতে চাইনে। পাটের ব্যবসা—জুয়ো খেলা, হেরে গেলে তোমার গহনাগুলো যাবে।

কিন্তু অনঙ্গ শুনিল না। সেও নিতান্ত ভীতু-ধরণের মেয়ে নয়, এখন তাহার পিতৃবংশে যদিও কেহই নাই—কেবল এক বখাটে ভাই ছাড়া। একসময়ে তাহার বাবাও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন—ব্যবসাদারের দিল আছে তাহার মধ্যে। সে জোর করিয়া গহনা বিক্রয় করাইয়া সেই টাকায় মালের যোগান দিল। কিছু টাকা লাভও হইল।

যেদিন মিলের চেক ব্যাঙ্কে ভাঙানো হইবে, সেদিন গদাধর আসিয়া এক হাজার টাকা চাহিয়া বসিলেন। তিনি আজকাল বাড়ীতে বড়-একটা আসেন না। কোথায় রাত কাটান, কি ভাবে থাকেন, ভড়মশায় বা অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। এবার কিন্তু ভড়মশায় শক্ত হইয়া বলিলেন—বাবু, এ টাকা বৌ-ঠাকরুণের গহনা-বেচা টাকা। এ থেকে আপনাকে দিতে গেলে. তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তাঁর হুকুম ভিন্ন দিতে পারিনে।

গদাধর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—আড়ত আমার নামে, আপনার বৌ-ঠাকরুণের নামে নয়। আমার আড়তে অপরের টাকা খাটে কোন্ হিসেবে ?

—সে কথাটা বাবু আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন—আমি এর জবাব দিতে পারবো না।

—আপনি টাকা দিয়ে দিন, আমার বড্ড দরকার, পাওনাদারে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি এখন যাই, কাল সকালে আবার আসবো।

ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া কথাটা জানাইলেন। অনঙ্গ টাকা দিতে রাজী হইল না। তাহার ও তাহার ছেলেদের দশা কি হইবে, সে-কথা স্বামী কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? ওই দেড় হাজার টাকা ভরসা। বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না—তাই একরকমে সংসার চলিবে কিছুদিন ওই টাকায়।

পরদিন অনঙ্গ দুপুরে কলতলায় মাছ ধুইতেছে, হঠাৎ স্বামীকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। গদাধর কাছে আসিয়া বলিলেন—কেমন আছো ?

অনঙ্গ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। অনেকদিন দেখে নাই—প্রায় পনেরো-ষোলো দিন। স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো হইয়াছে, চেহারায় গেঁয়ো-ভাবটা অনেকদিন হইতেই দূর হইয়াছিল—বেশ চমৎকার চেহারা ফুটিয়াছে।

তবুও অভিমানের নীরসতা কণ্ঠে আনিয়া সে বলিল—ভালো থাকি আর না থাকি, তোমার তাতে কি? দেখতে এসেছিলে একদিন, মরে গিয়েছে বাড়ীসুদ্ধ, না বেঁচে আছে?

—তুমি আজকাল বড় রাগ করো। আমি কাজ নিয়ে বড় ব্যস্ত আছি, ষ্টুডিওতে খাই, ষ্টুডিওতেই শুই—তাই সময় পাইনে—কিন্তু ভড়মশায়ের কাছে রোজই খবর পাচ্চি ফোনে—রোজ ফোন্ করি গদিতে।

—বেশ করো। না করলেই-বা কি ক্ষতি?

—কার কথা বলবো—তোমার, না আমার?

—দুজনেরই। যাক্, এখন কি মনে ক'রে অসময়ে? খাওয়া হয়নি, তা মুখ দেখেই বুঝতে পারচি। ঘরে গিয়ে বোসো, আমি মাছ ক'টা ধুয়ে আসচি।

একটু পরে অনঙ্গ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্বামী ছেলেদের লইয়া গল্প করিতেছেন। অনঙ্গ বলিল—চা খাবে নাকি? এখনও রান্নার দেরি আছে কিন্তু।

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আমার দেরি করলে চলবে না। চা বরং একটু করে দাও—আর আমি এসেছিলাম যে জন্যে…

অনঙ্গ বলিল—সে আমি শুনেচি। সে হবে না।

—টাকা তুমি দেবে না অনঙ্গ? লক্ষ্মীটি, বড্ড বিপদে পড়েচি। একটা মেসিনের কিস্তির টাকা কাল দিতে হবে, নইলে তারা মেসিন উঠিয়ে নিয়ে যাবে—ষ্টুডিওর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তাহ'লে। লক্ষ্মীটি, অমত করো না। বড় আশা ক'রে এসেচি।

গদাধরের চোখে মিনতির দৃষ্টি! অনঙ্গর মন এতটুকু দমিত না, বা টলিত না, যদি স্বামী তম্বি-গম্বি করিত বা রাগঝাল দেখাইত। কিন্তু স্বামীর অসহায় মিনতির দৃষ্টি তাহার মতিভ্রম ঘটাইল। সে নিজেকে দৃঢ় রাখিতে পারিল না।

গদাধর টাকা আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই টাকা দেওয়ার মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য অনঙ্গকে পরে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

মাসখানেক পরে আদালতের বেলিফ্ আসিয়া বাড়ী শিল করিয়া গেল। বন্ধকী বাড়ী পাছে বেনামী বা হস্তান্তর হয়, তাই মহাজন ডিগ্রীর আগেই বাড়ী কোর্ট হইতে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

গদাধরের অবস্থা যে কত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, ভড়মশায় তাহা ইদানীং বেশ ভালো করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন। আড়তের ঠিকানায় বহু পাওনাদার আসিয়া জুটিতে লাগিল। ভড়মশায় পাকা লোক—তাহাদের ভাগাইয়া দিলেন। এ ফার্ম্মের সঙ্গে ও-সব দেনার সম্বন্ধ কি? অনেকে শাসাইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু যেদিন খবর পাওয়া গেল যে, আদালতের বেলিফ্ বাড়ী শিল করিবে, সেদিন ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া সব খুলিয়া বলিলেন। অনঙ্গ বলিল—আমাদের কি উপায় হবে?

—একটা ভাড়াটে-বাড়ী আজ রাত্রের মধ্যেই দেখি, কাল সেখানে উঠে যাওয়া যাক্।

—তার চেয়ে চলুন, দেশে ফিরে যাই ভড়মশায়। সেখানে গেলে আমার মন ভালো থাকবে।

—এই অবস্থায় সেখানে যাবেন বৌ-ঠাকরুণ ? লোকে হাসবে না ?

—হাসুক ভড়মশায় ! আমার স্বামীর, আমার শ্বশুরের ভিটেতে আমি না খেয়ে একবেলা প'ড়ে থাকলেও আমার কোনো অপমান নেই। সেখানে সজনে-শাক সেদ্ধ ক'রে খেয়েও একটা দিন চলে যাবে, এখানে তা হবে না। আপনি চলুন দেশে।

—আমারও তাই মত বৌ-ঠাকরুণ। আপনার যদি তাতে মন না দমে, আজই চলুন না কেন ?

আট

অনেকদিন পরে অনঙ্গ আবার দেশের বাড়ীতে ফিরিল।

গত চার বছরের বর্ষার জল পাইয়া দু'খানা ছাদ বসিয়া গিয়াছে, উঠানে ভাঁটশেওলার বন ; পাঁচিলে ও কার্নিসে বনমূলা ও চিচ্চিড়ের ঝাড়, রোয়াকে ও দেওয়ালের গায়ে প্রতিবেশীরা ঘুঁটে দিয়াছে। দু'একজোড়া জানালার কবাট কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে বেওয়ারিশ মাল বিবেচনায়। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অনঙ্গ চোখের জল রাখিতে পারিল না।

একটা কুলুঙ্গিতে অনঙ্গর শাশুড়ী লক্ষ্মীর বাটা রাখিতেন, শাশুড়ীর নিজের হাতের সিঁদুরের কৌটার পুতুল এখনও কুলুঙ্গির ভিতরে আঁকা। যে খাটে অনঙ্গ নববধূরূপে ফুলশয্যার রাত্রি যাপন করিয়াছিল, পশ্চিমের ঘরে সে প্রকাণ্ড সেকেলে কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোষখানা উইয়ে-খাওয়া অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান।

বাড়ী আসিয়া নামিবার কিছু পরে, পাশের বাড়ীর বড়-তরফের কর্ত্রী-ঠাকরুণ এ-বাড়ী দেখিতে আসিলেন। অনঙ্গ তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছো দিদি? বট্ঠাকুর ভালো, ছেলেপিলে সব···

—হ্যাঁ, তা সব এক-রকম—কিন্তু বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্ ছোটবৌ। আহা, শচীনের (ইনি শচীনের মা) কাছে সব শুনলাম। তা ঠাকুরপো যে কলকাতায় গিয়ে এ-রকম ক'রে উচ্ছন্নে যাবে, তা কে জানতো। শুনলাম নাকি এক মাগী নাচওয়ালী না কি ওই বলে আজকাল—তাকে নিয়ে কি ঢলাঢলি, কি কাণ্ড! একেবারে পথে বসিয়ে দিলে তোদের ছোটবৌ, কিছু নেই, বাড়ীখানা পর্য্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল গো! আহা-হা···

অনঙ্গর চিত্ত জ্বলিয়া গেল বড়বৌয়ের কথার ধরণে। সহানুভূতি দেখাইবার ছুতায় আসিয়া এ যে একপ্রকার গায়ের ঝাল ঝাড়া আর কি! বড়-তরফ যখন যে গরীব সেই গরীবই থাকিল, ছোট-তরফের তখন অত বাড় বাড়িয়া কলিকাতায় বাড়ী কেনা, আড়ত ও ছবি তুলিবার কোম্পানী খোলা—এসব কেন? কথায় বলে, 'অত বাড় বেড়োনাক ঝড়ে ভেঙে যাবে'—এখন কেমন?

অনঙ্গ ঝগড়াটে স্বভাবের মেয়ে কোনোদিনই নয়। ভগবান যখন পাঁচজনকে দেখিতে দিয়াছেন—দেখুক।

কলিকাতার বাড়ীর জন্য ডবল পালঙ্ক, কয়েকখানা সোফা ও একটা বড় কাঁচ-বসানো আলমারি অনঙ্গ সখ করিয়া কিনিয়াছিল—এত কষ্টের মধ্যেও সেগুলি সে বেচিয়া বা ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। গত সুখের দিনের স্মৃতিচিহ্ন এগুলি—অনঙ্গ এখানকার ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বড়বৌ সেগুলি দেখিয়া বলিলেন—এসব আর এখন কি হবে ছোটবৌ, বিক্রি ক'রে দিয়ে এলে তবুও দু-দিন চলতো সেই টাকায়! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বলিস্ তো খাট-আলমারির খদ্দের দেখি,—ওই মুখুজ্যেদের গিন্নি বলছিল একখানা খাট ওর দরকার।

অনঙ্গ বলিল—আচ্ছা দিদি, আমি তোমায় জানাবো দরকার বুঝে। এনেছি যখন, এখন থাকুক—জায়গার তো অভাব নেই রাখবার, কারো ঘাড়েও চেপে নেই!

দিন যাহা হউক একপ্রকার কাটিতে লাগিল! অনঙ্গর মনে কিন্তু বড় দুঃখ, স্বামী তাহার পর হইয়া গেল। এত কষ্টের ও পরের টিটকারীর মধ্যেও যদি স্বামীকে সে কাছে পাইত, এসব দুঃখ-কষ্টকে সে আমল দিত না। পুরাণো বাড়ীর কার্নিসের ফাঁকে গোলা-পায়রার ঝাঁক আর পুরাণো দিনের মত ডানা ঝট্‌পট্ করে না, সুখের পায়রা অন্য কোনো সুখী গৃহস্থের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে বাড়ীর কানাচে রাত্রিবেলা পেঁচার কর্কশ স্বর শোনা যায় রাত দুপুরে, আমড়া গাছের মাথায় চাঁদ ওঠে, একা-একা ছেলে দুটি লইয়া এই

শতস্মৃতিভরা বাড়ীতে থাকিতে তাহার বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে প্রতিদিন কলিকাতা হইতে আনা সেই পালঙ্কে শুইবার সময়।

রাত্রি নির্জ্জন—বাড়ীটা ফাঁকা—কেহ কোথাও নাই আজ। দিনের বেলায় তবু কাজ লইয়া ভুলিয়া থাকা যায়, রাতের নির্জ্জনতা যখন বুকে চাপিয়া বসে—তাহার বুক হূ হূ করে, শত্রু হাসাইবার ভয়ে যে কান্নার বেগ দিনমানে চাপিয়া রাখিতে হয়—রাতে তাহা আর বাধা মানে না।

হাতে বিশেষ পয়সা আর নাই—ভড়মশায়ের সাহায্যে সে ছোট-খাটো খুচরা ব্যবসা চালাইতে লাগিল। মূলধন নাই, হাটবারে রাস্তার ধারে পাটের ফেটি কিনিয়া কোনোদিন একমণ, কোনোদিন-বা কিছু বেশী মাল কৃষ্ণ দাঁয়ের আড়তে বিক্রি করিয়া নগদ আট আনা কি বারো আনা লাভ হইত, হাত-খরচাটা একরূপ চলিয়া যায় তাহা হইতে।

মূলধনের অভাবে বেশি পরিমাণে খরিদ-বিক্রি করা চলিল না, দুর্দ্দিনের বন্ধু ভড়মশায় অনেক চেষ্টা করিয়াও কোথাও বেশী পুঁজি জুটাইতে পারিলেন না।

একদিন নির্ম্মল দেখা করিতে আসিল।

অনঙ্গ সন্তুষ্ট ছিল না নির্ম্মলের উপর—তবুও জিজ্ঞাসা করিল—ওঁর খবর জানো ঠাকুরপো?

—কলকাতাতেই আছে শচীনের কাছে শুনেচি।

—তুমি ঠিকানা জানো ঠাকুরপো? বাড়ীতে একবার আসতে বলো

না ওঁকে। যা হবার হয়েচে, তা ভেবে আর কি হবে। বাড়ীতে এসে বসুন, আমি চালাবো, ওঁকে কিছু করতে হবে না।

—পাগল হয়েচো বৌদি? গদাধরদাকে চেনো না? বলে, মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার! সে এসে ব'সে তোমার ওই পাটের ফেটির ব্যবসা করবে? তাছাড়া তার এখনো রাজ্যের দেনা। কলকাতা ছেড়ে আসবার যো নেই।

—কত টাকা দেনা, ঠাকুরপো?

—তা অনেক। নালিশ হয়েচে তিন-চারটে—জেলে যেতে না হয়!

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বলিল—বলো কি ঠাকুরপো! এত দেনা হলো কি ক'রে? ছবি চললো না?

—সে নানা গোলমাল। যে মেয়েটির ওপর ভরসা ক'রে ছবি তৈরী করা হচ্ছিলো, তার হয়ে গেল বিয়ে। সে আর ছবিতে নামলো না। অন্য একটি মেয়েকে দিয়ে সে পার্ট করানো হতে লাগলো—ছবি একরকম ক'রে হয়ে গেল। কিন্তু সকলেই জেনে গিয়েছিল যে, রেখা দেবী—মানে, সে মেয়েটি এ-ছবিতে শেষপর্য্যন্ত নেই—ছবি তেমন জোব চললো না। গদাধরদা বড্ড ভুল করলে—একটি খুব নামজাদা অভিনেত্রী ইচ্ছে ক'রে ছবিতে নামতে চেয়েছিল, গদাধর তাকে নেয়নি—শচীনের মুখে শুনলাম!

—কেন?

—তা কি ক'রে বলবো? বোধ হয় মন-কসাকসি ছিল।

—আগে থেকে জানা ছিল নাকি তার সঙ্গে?

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—খু-ব। কেন, তুমি কিছু জানো না বৌ-

ঠাকরুণ ? তার কাছে গদাধরদা অনেক টাকা ধার করেছিল, সেও তো একজন বড় পাওনাদার। তার নাম শোভারাণী। আমি শচীনের কাছে শুনেচি, ভড়মশায় একবার সে দেনার সম্পর্কে মেয়েটির বাড়ী গিয়েছিল।

—তারপর কি হলো ?

—টাকা কি কেউ ছাড়ে ? সেও নালিশ করেচে শুনচি। তারও তো রাগ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনঙ্গ বলিল—এত কথা আমি জানিনে তো ঠাকুরপো ! আমাকে কেউ বলেওনি। আমি না হয় গহনা বেচে তার দেনা শোধ করতাম।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—সে অনেক টাকা দেনা বৌ-ঠাকরুণ। তোমার গহনা ইদানীং যা ছিল, তা বেচে অত টাকা হবে কোথা থেকে ? সে শুনেচি, হাজার চার-পাঁচ টাকা !

অনঙ্গ আকুলকণ্ঠে বলিল—হোক্‌গে যত টাকা, তুমি একটা কাজ করো ঠাকুরপো—তুমি তাকে যে ক'রে পারো একবার এখানে এনে দাও। দেখিনি কতদিন ! আমার মন যে কি হয়েচে, সে শুধু তুমি বলেই বলচি। এই উপকারটা করো তুমি। দেনা আমি যে ক'রে হোক্, জমি-জায়গা বেচে হোক্, শোধ ক'রে দেবো—আমি নিজে এখন ব্যবসা বুঝি—করচিও তো।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—তুমি জানো না বৌদি, তোমার ধারণা নেই। তুমি যা ভাবচো, তা নয়। দেনা বিশ হাজারের কম নয়—সে তুমি তোমার ওই সামান্য ব্যবসা করেও শোধ করতে পারবে না, জায়গা-জমি বেচেও পারবে না।

—তাহ'লে কি হবে ঠাকুরপো ?

—কি হবে, কিছুই বুঝতে পারচিনে। আর কিছুদিন না গেলে···

নির্ম্মল চলিয়া গেল। অনঙ্গ বসিয়া-বসিয়া কত কি ভাবিল। সেদিন আর তাহার মুখে ভাত উঠিল না। ভড়মশায়কে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে বসিল। ভড়মশায় পাকা বিষয়ী লোক, সব শুনিয়া বলিলেন—এর তো কোনো কূলকিনেরা পাচ্চিনে বৌ-ঠাকরুণ !

অনঙ্গ চিন্তিতমুখে বলিল—আপনার হাতে এখন কত টাকা আছে ?

অনঙ্গর মুখের দিকে চাহিয়া ভড়মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আন্দাজ শ'দুই-আড়াই। কি করতে চান্ বৌ-ঠাকরুণ ? ওতে বাবুর দেনা শোধ যাবে না।

—আপনি একবার কলকাতা যান ভড়মশায়, নির্ম্মল-ঠাকুরপো বলছিল, তাঁর নাকি দেনার দায়ে জেল হবে, একবার আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন ভড়মশায়—আমি স্থির থাকতে পারচিনে যে একেবারে, এ-কথা শুনে কি আমার মুখে ভাতের দলা ওঠে ? আপনি আজ কি কাল সকালেই যান একবার।

—আজ হবে না বৌ-ঠাকরুণ, আজ হাটবার। টাকা-পঞ্চাশেক হাতে আছে, ও টাকাটায় ও বেলা পাট কিনতে হবে। যা হয় দুপয়সা তো ওই থেকেই আসচে।

পরদিন সকালে অনঙ্গ একপ্রকার জোর করিয়া ভড়মশায়কে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে দিল একখানা লম্বা চিঠি আর

একশোটি টাকা। ভড়মশায় টাকা দিতে বারণ করিয়াছিলেন, ইহা শুধু সংসার খরচের টাকা নয়, এই যে সামান্য ব্যবসায়ের উপর কষ্টে-স্বষ্টেও যা হোক একরকম চলিতেছে, এ টাকা সেই ব্যবসার মূল-ধনের একটা অংশও বটে। অনঙ্গ শুনিল না। তিনি বিপদের মধ্যে আছেন, যদি তাঁহার কোনো দরকারে লাগে!

নয়

ভড়মশায় সটান গিয়া শোভারাণীর বাড়ী উঠিলেন। চাকরের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলেন, গদাধরবাবু বহুদিন যাবৎ এখানে আসেন না।···মাইজি? না, মাইজি এখন ষ্টুডিওতে। এসময় তিনি বাড়ী থাকেন না কোনোদিন।

শচীনের কাছে সন্ধান মিলিল। দক্ষিণ-কলিকাতার একটা মেসের বাড়ীর ক্ষুদ্র ঘরে কেওড়া-কাঠের তক্তাপোষে বসিয়া মনিব বিড়ি খাইতেছেন, এ অবস্থায় ভড়মশায় গিয়া পৌঁছিলেন।

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—কি খবর, ভড়মশায় যে! আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?

—প্রণাম হই বাবু।

বলিয়াই ভড়মশায় কাঁদিয়া ফেলিলেন!

···আরে-আরে, বসুন-বসুন, কি হয়েছে—ছিঃ! আপনি নিতান্ত···

চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ভড়মশায় বলিলেন—বাবু, আপনি বাড়ী চলুন।

—বাড়ী যাবার যো নেই এখন ভড়মশায়। সে-সব অনেক কথা। সকল কথা শুনেও দরকার নেই,—আমার এখন বাড়ী যাওয়া হয় না।

—বৌ-ঠাকরুণ কেঁদে-কেটে···

—কি করবো বলুন, এখন আমার যাবার উপায় নেই—বসুন। ঠাণ্ডা হোন। খাওয়া-দাওয়া করুন এখানে এবেলা

ভড়মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো ?

—কি, বলুন।

—আপনাকে সংসারের ভার নিতে হবে না। আমি ফেটি পাটের কেনাবেচা ক'রে একরকম যাহয় চালাচ্চি—আপনি গিয়ে শুধু বাড়ীতে ব'সে থাকবেন।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভড়মশায়, আমি এখন গাঁয়ে গেলে যদি চলতো, আমি যেতুম। আমার সঙ্গে-সঙ্গে সমনজারি করতে পেয়াদা ছুটবে দেশের বাড়ীতে, আর বড়-তরফের ওরা হাসাহাসি করবে! সে-সব হবে না—তাছাড়া আমি আবার একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি।

ভড়মশায় বলিলেন—আপনার জন্যে বৌ-ঠাকরুণ কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার কাছে আছে।

ভড়মশায় দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন যে, মনিব টাকার কথা শুনিয়া বিশেষ-কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। নিস্পৃহ ভাবে বলিলেন—কত ?

—আজ্ঞে, পঞ্চাশ টাকা।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ওতে কি হবে ভড়মশায়? আমায় হাজার-তিনেক টাকা কোনোরকমে তুলে দিতে পারেন এখন? তাহ'লে কাজের খানিকটা অন্তত মীমাংসা হয়।

—না বাবু, সে সম্ভব হবে না! ফেটি পাট কিনি ফি হাটে ষাট-সত্তর···বড় জোর একশো টাকার। তাই গণেশ কুণ্ডুর আড়তে বিক্রি ক'রে কোনো হাটে পাঁচ, কোনো হাটে চার—এই লাভ। এতেই বৌ-ঠাকরুণকে সংসার চালাতে হচ্চে। তাঁরই পুঁজি—তিনি যে এই পঞ্চাশ টাকা দিয়েচেন—তাঁর সেই পুঁজি ভেঙে। আমায় বললেন, বাবুর কষ্ট হচ্চে ভড়মশায়, আপনি গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসুন। অমন লক্ষ্মী মেয়ে··

গদাধর অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—আচ্ছা, থাক্। আপনি ও টাকাটা দিয়েই যান আমায়। অন্তত যে ক'দিন জেলের বাইরে থাকি, মেস খরচটা চলে যাবে।

জেলের কথা শুনিয়া ভড়মশায় রীতমত ভয় পাইয়া গেলেন। মনিব জেলে যাইবার পথে উঠিয়াছেন—সে কেমন কথা? এ-কথা শুনিলে বৌ-ঠাকরুণ কি স্থির থাকিতে পারিবেন? এই মেসেই ছুটিয়া আসিবেন দেখা করিতে হয়তো। সুতরাং এ-কথা সেখানে গিয়া উত্থাপন না করাই ভালো। তিন হাজার টাকার যোগাড় করিতে না পারিলে যদি জেলে যাওয়ার মীমাংসা না হয়, তবে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ, সে টাকা কোনোরকমেই এখন সংগ্রহ করা যাইতে পারে না।

পঞ্চাশটি টাকা গুণিয়া মনিবের হাতে দিয়া ভড়মহাশয় বিদায় লইলেন। দেশে পৌঁছিতে পরদিন সকাল হইয়া গেল। অনঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি, কি-রকম দেখলেন ভড়মশায়? দেখা হলো? ওঁর শরীর ভালো আছে? কবে বাড়ী ফিরবেন বললেন?

—বলচি বৌ-ঠাকরুণ—আগে আমায় একটু চা ক'রে যদি···

—হ্যাঁ, তা এক্ষুণি দিচ্ছি। বলুন আগে—উনি কেমন আছেন? দেখা হয়েচে?

—সব হয়েচে। ভালো আছেন।

—আছেন কোথায়? টাকা দিয়েচেন?

—আছেন একটা কোন্ মেসের বাড়ীতে। দিব্যি আলাদা একটা ঘর! আমায় যেতেই খুব খাতির···বেশ চেহারা হয়েচে।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই অনঙ্গ খুশীতে গলিয়া গিয়া বলিল—আচ্ছা, বসুন, আমি এসে সব শুনচি, আগে চা ক'রে আনি আপনার জন্যে।

ভড়মশায় ডাকিয়া বলিলেন—হ্যাঁ বৌমা···এই কিছু বিস্কুট আর লেবেঞ্চুস খোকাদের জন্যে···এটা রাখো।

কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গ চা আনিয়া রাখিল, তার সঙ্গে একবাটি মুড়ি। সে হঠাৎ বন্য হরিণীর ন্যায় চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—হাতে-পায়ে বল ও মনে নতুন উৎসাহ পাইয়াছে। ভড়মশায় সব বুঝিলেন, বুঝিয়া একমনে চা ও মুড়ি চালাইতে লাগিলেন।

—হ্যাঁ, তারপর বলুন ভড়মশায়।

—হ্যাঁ, তারপর তো সেই মেসের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

—মেসের বাড়ীতে উঠলেন কেন? চেহারার কথা বলছিলেন—মানে, শরীরটা…

—সুন্দর চেহারা হয়েচে। কলকাতায় থাকা…তার ওপর আজকাস একটু অবস্থা ফিরতির দিকে যাচ্ছে…আমায় বললেন—মনে একটু স্ফূর্ত্তি দেখা দিয়েচে কিনা!

—টাকা দিয়ে এলেন তো?

ভড়মশায় লংক্লথের আধময়লা কোটের সুবৃহৎ ঝোলা-সদৃশ পকেট হাতড়াইতে-হাতড়াইতে বলিলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা—টাকা সব নিলেন না। পঞ্চাশটি নিয়ে বললেন, এখন আর দরকার নেই, বাড়ীতে তো টানাটানি যাচ্চে…তা—এই সেই বাকি টাকাটা একটা খামের মধ্যে—সামনের হাটে এতে…

কথাটা শুনিয়া অনঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। স্বামী যখন টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন—তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অবস্থা ভালোর দিকে যাইতেছে। বাঁচা গেল, লোকে কত কি বলে, তাহা শুনিয়া তাহার যেন পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়া যায়। মা সিদ্ধেশ্বরী মুখ চাহিয়াছেন এতদিন পরে।

সে একটু সলজ্জ-কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, আমাদের—আমার কথা-টথা কিছু—মানে, কেমন আছিটাছি…

ভড়মশায় তাহার মুখের কথা যেন লুফিয়া লইয়া বলিলেন—ঐ ছ্যাখো, বুড়োমানুষ বলতে ভুলে গিয়েচি। সে কত কথা…অনেকক্ষণ ধ'রে বললেন তোমাদের কথা বৌ-ঠাকরুণ। তোমার সম্বন্ধেও…

—ও! কি বললেন? এই কেমন আছি, মানে…

নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার কণ্ঠে ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সুর আসিয়া গেল।

ভড়মশায় মৃদু-মৃদু হাসিমুখে বলিলেন—এইসব বললেন—একা ওখানে থেকে মনে শান্তি নেই তাঁর। অথচ এ-সময়টা দেশে আসতে গেলে, কাজের ক্ষতি হয়ে যায় কিনা! তোমার কথা কত-ক্ষ-ণ ধ'রে বললেন। আসবার সময় ঐ বিস্কুট লেবেঞ্চুস তো তিনিই কিনে দিলেন!

—আপনাকে শেয়াল-দ' ইষ্টিশানে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন বুঝি?

—হ্যাঁ, তাই তো। উঠিয়েই তো দিয়ে গেলেন—সেখানেও তোমার কথা···

অনঙ্গ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল গোপন করিল।

ভড়মশায় চলিয়া আসিলেন! এভাবে বেশীক্ষণ চালানো সম্ভব নয়, হয়তো-বা কোথায় ধরা পড়িয়া যাইবেন। বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা আছে। তবে স্বামীর ব্যাপার লইয়া কথাবার্ত্তা উঠিলে বৌ-ঠাকরুণ সহজেই ভুলিয়া যান—এই রক্ষা।

ভড়মশায় কি সাধে মনিবকে বাকি পঞ্চাশটি টাকা দেন নাই? বৌ-ঠাকরুণ বা ছেলেদের কথা তো একবারও লোকে জিজ্ঞাসা করে—এতদিন পরে যখন দেখা? অমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী, ছেলেরা বাড়ীতে—তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা নয়? সেখানে ভড়মশায় দিতে যাইবেন—টাকা? তা তিনি কখনো দিবেন না।

শরৎকাল চলিয়া গেল। আবার হেমন্ত আসিল।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনঙ্গ প্রতিদিনই আশা করিয়াছে—স্বামী

হঠাৎ আজ হয়তো আসিয়া পড়িবেন। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

ভড়মশায় আসিয়া বলেন,—বৌ-ঠাকরুণ, টাকা দিতে হবে।

—কত ?

—ছত্রিশ টাকা দাও আজ, পাট আর আসচে না হাটে! ওতেই কাজ চলে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা লাভের দু'তিন টাকা-সুদ্ধ টাকাটা আবার ফিরাইয়া দিয়া যান। একদিন শশী বাগদিনী অনঙ্গকে পরামর্শ দিল—হলুদের গুঁড়োর ব্যবসা করিতে। উহাতে খুব লাভ, আস্ত হলুদ বাজার হইতে কিনিয়া বাগদি-পাড়ায় দিলে, তাহাদের ঢেঁকিতে তাহারাই কুটিয়া দিবে —মজুরী বাদেও যাহা থাকে, তাহা অনঙ্গ হিসাব করিয়া দেখিল নিতান্ত মন্দ নয়। আজকাল সে ব্যবসা বুঝিতে পারে, ব্যবসার বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে। ভড়মশায়কে কথাটা বলিতে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

—হুঁঃ—ফুঃ! গুঁড়ো হল্‌দির আবার ব্যবসা ?

অনঙ্গ বলিল—না ভড়মশায়, আমি হিসেব ক'রে দেখেচি—আপনি আমায় হলুদ কিনে দিন দিকি, আমি বাগদি-পাড়া থেকে কুটিয়ে আনি···

দু'তিনবার হলুদের গুঁড়ো কেনাবেচা করিয়া দেখা গেল, পাটের খুচরো কেনাবেচার চেয়েও ইহাতে লাভের অঙ্ক বেশি। আর একটা সুবিধা, এ-ব্যবসা বারোমাস চলিবে। বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির উপর ভড়মশায়ের শ্রদ্ধা জন্মাইল। টাকা বসিয়া থাকে না, অনঙ্গ নানা বুদ্ধি করিয়া এটা-ওটার ব্যবসায়ে খাটাইয়া যতই সামান্য হউক, তবুও কিছু-কিছু আয় করে। কিন্তু বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে।

অনঙ্গ একদিন জ্বরে পড়িল। জ্বর লইয়াই গৃহকর্ম্ম করিয়া রাত্রের দিকে জ্বর বেশ বাড়িল। আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল বিছানায়—উঠিবার শক্তি নাই। অতবড় বাড়ী, কেহ কোথাও নাই—কেবল এই ঘরখানিতে সে আর তাহার দুটি ছেলে-মেয়ে।

বড় খোকা আট বছরে পড়িয়াছে। সে বলিল—মা, আমাদের এবেলা ভাত দেবে কে?

অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল—সে প্রথমটা কোনো উত্তর দিল না। পরে বিরক্ত হইয়া ছেলেকে বকিয়া উঠিল। খোকা কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ আরও বকিয়া বলিল—কাণের কাছে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করিস্‌নে বলচি খোকা—খাবি কি তা আমি কি বলবো? আপদগুলো মরেও না যে আমার হাড় জুড়োয়! তোদেব মানুষ করবে কে, জিগ্যেস্ করি? কে ঝক্কি পোয়ায়? যা, বাসিভাত হাঁড়িতে আছে, বেড়ে নে।

পরদিন ভড়মশায় আসিয়া দেখিলেন, ছেলে দুটি রান্নাঘরের সামনে ভাতের হাঁড়ি বাহির করিয়া, একটা থালায় তাহা হইতে একরাশ পান্তা ভাত ঢালিয়া এঁটো হাতে সমস্ত মাখামাখি করিয়া ভাত খাইতেছে। অনঙ্গ আবার একটু শুচিবাইগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে আজকাল—তাহার বাড়ীতে এ কি কাণ্ড! ছেলে দুটো এঁটো-হাতে রান্নার হাঁড়ি লইয়া ভাত তুলিয়া খাইতেছে কি-রকম?

আশ্চর্য্য হইয়া ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি খোকা? ও কি হচ্চে? মা কোথায়?

খোকা ভড়মশায়কে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাতের দলা তুলিতে

গিয়া হাত গুটাইয়াছিল। মুখের দু'পাশের ভাত ক্ষিপ্রহস্তে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—মা'র জ্বর। আমরা কাল রাত্রে কিছু খাইনি, তাই পলুকে ভাত বেড়ে দিচ্চি। মা কাল বলেছিল, হাঁড়ি থেকে নিয়ে খেতে।

সে এমন ভাব দেখাইল যে, শুধু ছোট ভায়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই তাহার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। তাহার খাওয়ার উপর বিশেষ কোনো স্পৃহা নাই।

—বলো কি খোকা! জ্বর তোমার মা'র? কোথায় তিনি?

খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—বিছানায় শুয়ে। কথা বলচে না কিচ্ছু—এত ক'রে বললাম, আমি নুন পাড়তে পারিনে, পলুকে কি দেবো, তা মা···

ভড়মশায় ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া উঁকি মারিলেন। অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে অভিভূত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার কোনো সাড়া-সংজ্ঞা নাই—লেপখানা গা হইতে খুলিয়া একদিকে বিছানার বাহিরে অর্দ্ধেক ঝুলিতেছে!

ভড়মশায় ডাকিলেন—ও বৌ-ঠাকরুণ! বৌ-ঠাকরুণ!

অনঙ্গ কোনা সাড়া দিল না।

—কি সর্ব্বনাশ! এমন কাণ্ড হয়েচে তা কি জানি? ও বৌ-ঠাকরুণ!

দু'তিনবার ডাকাডাকি করার পরে অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে—'অ্যাঁ'—করিয়া সাড়া দিল। সে সাড়ার কোনো অর্থ নাই। তাহা অচেতন মনের বহুদিনব্যাপী অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহার পিছনে বুদ্ধি নাই···চৈতন্য নাই।

ভড়মশায় ছুটিয়া গিয়া গিরীশ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন—কোনো চিন্তা নাই, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, তবে একটু সাবধানে রাখা দরকার। ভড়মশায়ের নিজের স্ত্রী বহুদিন পরলোকগত—এক বিধবা ভাইঝি থাকে বাড়ীতে, তাহাকে আনাইয়া সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন—প্রতিবেশীরা বিশেষ কেহ উঁকি মারিল না।

চৌদ্দ-পনেরো দিন পরে অনঙ্গ সারিয়া উঠিয়া জীর্ণ-মুখে পথ্য করিল। কিন্তু তখনও সে অত্যন্ত দুর্ব্বল—উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই।

ভড়মশায় এতদিন জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পান নাই, আজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌ-ঠাকরুণ, টাকা কোথায় ?

—টাকা সিন্দুকে আছে।

—চাবিটা দাও, দেখি।

এদিক-ওদিক খুঁজিয়া চাবি পাওয়া গেল না। বালিশের তলায় তো থাকিত, কোথায় আর যাইবে, এখানে কোথাও আছে। সব জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, অবশেষে কামার ডাকাইয়া তালা ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, সিন্দুকে কিছুই নাই। টাকা তো নাই-ই, উপরন্তু অনঙ্গর হাতের দু'গাছা সোনা-বাঁধানো হাতীর দাঁতের চুড়ি ছিল, তাহাও উবিয়া গিয়াছে। আর গিয়াছে গদাধরের পিতামহের আমলের সোনার তৈরী ক্ষুদ্র একটী শীতলা-মূর্ত্তি। ক্ষুদ্র হইলেও প্রায় ছ'সাত ভরি ওজনের সোনা ছিল মূর্ত্তিটাতে।

বহুকষ্টে অর্জ্জিত অর্থের সঙ্গে শীতলা-মূর্ত্তির অন্তর্ধানে, নানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় অনঙ্গ মাথা ঠুকিতে লাগিল।

ভড়মশায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আজ এক বৎসরের বহু কষ্টে সঞ্চয়-করা যৎসামান্য পুঁজি যাহা ছিল, কোনো-রকমে তাহাতে হাত-ফেরতা খুচরা ব্যবসা চালাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল।

অবলম্বনহীন, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় এখন ইহাদের কি উপায় দাঁড়াইবে ?

ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাড়ীতে কে-কে আসতো ?

অনঙ্গ বিশেষ কিছু জানে না। তাহার মনে নাই। জ্বরের ঘোরে সে রোগের প্রথমদিকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত—কে আসিয়াছে, গিয়াছে, তাহার খেয়াল ছিল না। প্রতিবেশিনীরা মাঝে-মাঝে তাহাকে দেখিতে আসিত—শচীনের মা একদিন না দুদিন আসিয়াছিলেন, স্বর্ণ গোয়ালিনী একদিন আসিয়াছিল মনে আছে—আর আসিয়াছিলেন, মুখুয্যে-গিন্নী। তবে ইঁহাদের বেশির ভাগই অশুচি হইবার ভয়ে রোগীর ঘরের মধ্যে ঢোকেন নাই, দোরে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া, ডিঙাইয়া-ডিঙাইয়া উঠান পার হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার একটি ন্যায্য কারণ যে না ছিল তাহা নয়। বাড়ীর ছেলে দুটি মায়ের শাসনদৃষ্টি শিথিল হওয়ায় মনের আনন্দে যেখানে-সেখানে ভাত ছড়াইয়াছে, এটো থালাবাসন রাখিয়াছে, যাহা খুশি তাহাই করিয়াছে —সেখানে কোনো জাতিজন্মবিশিষ্ট হিন্দুর ঘরের মেয়ে কি করিয়া নির্ব্বিকারমনে বিচরণ করিতে পারে, ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। শুধু লোকের নিন্দা করিয়া লাভ নাই।

চুরির কোনো হদিস্ মিলিল না। উপরন্তু অনঙ্গ বলিল—

ভড়মশায়, আমার যা গিয়েচে, গিয়েচে—আপনি আর কাউকে বলবেন না চুরির কথা। শত্রু হাসবে, সে বড় খারাপ হবে। উনি শত্রু হাসাবার ভয়ে আজপর্য্যন্ত গাঁয়ে ফিরলেন না—আর আমি সামান্য টাকার জন্যে শত্রু হাসাবো? তিনি এত ক্ষতি সহ্য করতে পারলেন —আর আমি এইটুকু পারবো না, ভড়মশায়?

সুতরাং ব্যাপার মিটিয়া গেল।

ভড়মশায় কলিকাতায় মেসের ঠিকানায় দু'তিনখানা চিঠি দিয়া কোনো উত্তর পাইলেন না। অবশেষে সব কথা খুলিয়া লিখিয়া একখানি রেজিষ্ট্রী চিঠি দিলেন—চিঠি ফেরত আসিল, তাহার উপর কৈফিয়ৎ লেখা…'মালিক এ ঠিকানায় নাই'।

অনঙ্গের হাতে দু'গাছা সোনা-বাঁধানো শাখা ছিল। খুলিয়া তাহাই সে বিক্রয় করিতে দিল। সেই যৎসামান্য পুঁজিতে হলুদের গুঁড়ার ব্যবসা করিয়া কোনো হাটে বারো আনা, কোনো হাটে-বা কিছু বেশি আসিতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে সামান্য একটা ভেলা হয়তো—কিন্তু জাহাজ যেখানে মিলিতেছে না, সেখানে ভেলার মূল্যই কি কিছু কম?

অনঙ্গ এখনও পায়ে বল পায় নাই। কোনোক্রমে রান্নাঘরে বসিয়া দুটি রান্না করে, ছেলে দুটিকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া রোয়াকের একপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া রৌদ্রে শুইয়া থাকে, কোনোদিন-বা একটু ঘুমায়। দুবেলা রান্না হয় না, হাঁড়িতে ওবেলার জন্য ভাত-তরকারি থাকে, সন্ধ্যার পরে ছেলে-মেয়েরা খায়।

একটু চুপ করিয়া শুইয়া দেখে, ধীরে ধীরে উঠানের আতাগাছটা লম্বা ছায়া ফেলিতেছে দোরের কাছে, পাঁচিলের গায়ে আমরুল শাকের

জঙ্গলে একটি প্রজাপতি ঘুরিতেছে, খোকার বাজনার টিনটা কুয়াতলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, পাশের জমিতে শচীনের সেওড়াতলী আমগাছটার মগ্‌ডালের দিকে রোদ উঠিতেছে ক্রমশঃ, নাইবার চাতালে গত-বর্ষায় বন-বিছুটির গাছ গজাইয়াছে—অনেকদিন আগে গদাধর কুয়াতলায় বসিয়া স্নানের জন্য সখ করিয়া একটি জলচৌকি গড়াইয়াছিলেন—সেখানা একখানা পায়া ভাঙা অবস্থায় কাঠ রাখিবার চালাঘরের সামনে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

বড়খোকাকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁরে, ও চৌকিখানা ওখানে অমন ক'রে ফেলেছে কে রে ?

খোকা এদিকে-ওদিকে চাহিতে-চাহিতে জলচৌকিখানা দেখিতে পাইল। বলিল—আমি জানিনে তো মা ! আমি ফেলিনি।

—যেই ফেলুক, তুই নিয়ে এসে দালানের কোণে রেখে দে। কেউ না ওতে হাত দেয়।

তারপর সে আবার দুর্ব্বলভাবে বালিশে ঢলিয়া পড়ে। মনেও বল নাই, হাতে-পায়েও জোর নাই যেন। তাহার ভালো লাগে না, একা-একা এ বাড়ীতে সে থাকিতে পারে না। জীবন যেন তাহার বোঝা হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া এই শীতের সন্ধ্যাবেলা মনের মধ্যে কেমন হূ হূ করে ! সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ! কেহ নাই যে, একটি কথা বলিয়া আদর করে, মুখের দিকে চায়। কত কথা মনে পড়ে—এমনি কত শীতের ঠাণ্ডা-রোদ সেওড়াতলী আমগাছটার মগ্‌ডালে উঠিয়া গিয়াছে আজ চৌদ্দ বছর ধরিয়া, চৌদ্দ বছর আগে এমনি এক শীতের মধ্যাহ্নে সে নববধূরূপে এ-গৃহে প্রথম প্রবেশ করে। ওই অতি

পরিচিত ঠাণ্ডা রোদ-মাখানো আমগাছটার দিকে চাহিলে কত ভালো দিনের কথা মনে পড়ে, কত আনন্দ-ভরা শীতের সন্ধ্যার স্মৃতিতে হৃদয় ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিয়া ওঠে।

চিরকাল কি এমনি কাটিবে?

মা মঙ্গলচণ্ডী কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?

ভড়মশায় হাটের টাকা লইয়া দরজার কাছে আসিয়া সাড়া দেন—বৌ-ঠাকরুণ? আছো বৌ-ঠাকরুণ?

—হ্যাঁ, আসুন। নেই তো আর যাচ্চি কোথায়?

—এগুলো গুণে নিও।

অনঙ্গ গুণিয়া বলিল—সাড়ে-তের আনা? আজ যে বেশি?

—হল্‌দির দর চড়ে গিয়েচে বাজারে। সামনের হাটে আরও হবে—আর কিছু বেশি টাকা হাতে আসতো এ-সময় তো একটা থোক লাভ করা যেতো হলুদ থেকে।

—আচ্ছা, ভড়মশায়?

অনঙ্গর গলার স্বরের পরিবর্ত্তনে ভড়মশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি? কি হলো?

—আচ্ছা, একবার আপনি কলকাতায় যাবেন?

—কলকাতায়? তা···

—তা নয় ভড়মশায়। অনেকদিন কোনো খবর পাইনি, আমার মনটা···আপনি একবার বরং···

স্বামীর কথা বলিতে গেলেই কোথা হইতে কান্না আসিয়া কেন যে গলার স্বর আট্‌কাইয়া লোকের সামনে লজ্জায় ফেলে এমনধারা!

ভড়মশায় চিন্তিতমুখে বল্লেন—তা—তা—গেলেও হয়।

—তাই কেন যান না আজই। একবার দেখে আসুন। আজ কত-দিন হলো, কোনো খবর পাইনি—শরীর-গতিক কেমন আছে, কি-রকম কি করচেন, আপনি নিজের চোখে দেখে এলে···

ভড়মশায় কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন। যাইতে অবশ্য এমন কি আপত্তি, তা নয়। তবে পয়সা খরচের ব্যাপার। এই নিতান্ত টানাটানির সংসারে এমনি পাঁচটা টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে যাতায়াতে। বৌ-ঠাকরুণ সে টাকা এখন পাইবেনই-বা কোথায়?

মুখে বলিলেন—আচ্ছা, দেখি।

—তাহ'লে কোন্ গাড়ীতে যাবেন আপনি?

—আজ কাল তো হয় না। হাটবার আসচে সামনে।

—হাটবার লেগেই থাকবে। আমি এক-রকম ক'রে চালিয়ে নেবো-এখন, আপনি যান—আমার কাছে তিনটে টাকা আছে, তুলে রেখে দিইচি, তাই নিয়ে যান।

সপ্তাহের শেষে অনঙ্গ আবার জ্বরে পড়িল। তবে এবার জ্বরটা খুব বেশি নয়, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, এসময় পাড়াগাঁয়ের ঘরে-ঘরেই এমন জ্বর লাগিয়া আছে, তাহাতে ডাক্তারও আসে না, বিশেষ কোনো ঔষধও পড়ে না! তবুও ভড়মশায় ডাক্তার ডাকানোর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অনঙ্গ কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিল—হ্যাঁ, আবার ডাক্তার কি হবে? বরং ডাকঘরের কুইনিন এক প্যাকেট কিনে দিন, তাই খেয়েই যাবে-এখন—ভারি তো জ্বর!

সে জ্বর তিন-চারদিন ভুগিয়া তখনকার মত গেল বটে, কিন্তু দুদিন

অন্ন পথ্য করিতে না করিতে আবার জ্বর দেখা দিল। একেই সে ভালো ভাবে সারিয়া উঠিতে পারে নাই প্রথম অসুখের পর, এভাবে বার-বার ম্যালেরিয়ায় পড়াতে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, রক্ত-হীনতার দরুণ মুখ হলদে ক্যাকাসে-রংএর হইয়া আসিল, শরীর রোগা, মাথার সামনের চুল উঠিয়া সিঁথির কাছটা কুশ্রী ধরণের চওড়া হইয়া গেল, ভাতে রুচি নাই, একবার পাতের সামনে বসে মাত্র, মুখে কিছু ভাল লাগে না।

সংসারে বেজায় টানাটানি চলিতেছিল, শীত পড়ার মুখে হলুদের দর একটু চড়াতে, হাটে-হাটে আগের চেয়ে আয় কিছু বাড়িল। অনঙ্গ আজকাল ব্যবসা বেশ বোঝে, সে নিজে অসুখ শরীরে শুইয়া-শুইয়া একদিন মুখুয্যে-বাড়ী হইতে শুক্‌নো পিপুল কিনিয়া আনাইল এবং সেগুলি হাটে পাঠাইয়া পাঁচ-ছ' টাকা লাভ করিল।

একদিন সে আবার ভড়মশায়কে ধরিল কলিকাতায় যাইবার জন্য।

ভড়মশায় বলিলেন—বেশ।

—বড় দেরি হয়ে যাচ্চে যাই-যাই ক'রে, কাজ তো আছেই, আপনি কালই যান। টাকা সকালে নেবেন, না এখন নেবেন?

—এখন পাঁচ জায়গায় ঘুরবো নিজের কাজে, কোথায় হারিয়ে যাবে। কাল সকালে বরং···

উৎসাহে অনঙ্গ মাদুর ছাড়িয়া ঠেলিয়া উঠিল বিকালে। পরদিন সকালে ভড়মশায় টাকা নিতে আসিলে, অনঙ্গ তাঁহার হাতে একটি বেশ ভারি-গোছের পৌটলা দিয়া বলিল—এটা ওঁকে দেবেন!

কাল সারাদিন ধরিয়া গুছাইয়াছে সে, ভড়মশায় দেখিলেন, তাহার মধ্যে হেন জিনিস নাই যা নাই। গোটাকতক কাঁচা পেঁপে, এমন কি একটা মানকচু পর্য্যন্ত। তা ছাড়া গাছের বরবটি, আমসত্ত্ব, পুরাণো তেঁতুল, পোস্তদানার বড়ি···

ভড়মশায় মনে-মনে হাসিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

অনঙ্গ আঁচল হইতে খুলিয়া আরও তিনটি টাকা বাহির করিয়া বলিল—ভাড়া বাদে একটা টাকা নিয়ে যান, যাবার সময় হরি ময়রার দোকান থেকে নতুনগুড়ের সন্দেশ সের-দুই নিয়ে যাবেন!

ভড়মশায় দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বলিলেন —চিঠি-টিঠি কিছু দেবে না?

—না, চিঠি আর দিতে হবে না, মুখেই বলবেন। একবার অবিশ্যি ক'রে যেন আসেন এরই মধ্যে, বলবেন।

ভড়মশায় দরজার বাহিরে পা ভালো করিয়া বাড়ান নাই, এমন সময় অনঙ্গ পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল—শুনুন, বাড়ী আসবার কথা বলবেন। বুঝলেন তো?

—আচ্ছা, বৌ-ঠাকরুণ, নিশ্চয় বলবো।

—এরই মধ্যে যেন আসেন—বুঝলেন?

ভড়মশায় ঘাড় হেলাইয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন যে, তিনি বেশ ভালোই বুঝিয়াছেন। কোনো ভুল হইবে না তাঁহার।

—আর যদি সঙ্গে ক'রে আনতে পারেন···

—বেশ বৌ-ঠাকরুণ। সে চেষ্টাও করবো।

দশ

ভড়মশায় দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ভড়মশায় মনিবের পুরাণো মেসে গেলেন। সংবাদ লইয়া জানিলেন, বহুদিন হইতেই গদাধরবাবু সে-স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেসের ম্যানেজার কোনো ঠিকানা বা সন্ধান দিতে পারিল না। তাহা হইলে কি জেলই হইল? তাহাই সম্ভব।

কিন্তু সে-কথা তো আর যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না!

ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি শচীনের বাসায় গেলেন। শচীনেরও দেখা পাইলেন না। এখন একমাত্র স্থান আছে, যেখানে মনিবের সন্ধান হয়তো মিলিতেও পারে—সেটি হইল শোভারাণীর বাড়ী। কিন্তু সেখানে যাইতে ভড়মশায়ের কেমন বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল। অনেকদিন সেখানে যান নাই, হয়তো তাহারা তাঁহাকে চিনিতেই পারিবে না, হয়তো বাড়ীতে ঢুকিতেই দিবে না। তাছাড়া সেখানে যাইতে প্রবৃত্তিও হয় না তাঁহার। তবুও যাইতে হইল। গরজ বড় বালাই।

দরজায় কড়া নাড়িতেই যে চাকরটি দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইল, ভড়মশায় তাহাকে চিনিলেন না। চাকর বলিল—কাকে দরকার?

—মাইজি আছেন?

—হ্যাঁ, আছেন।

—একবার দেখা করবো, বলো গিয়ে।

চাকর কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—এখন দেখা হবে না।

ভড়মশায় অনুনয়ের সুরে বলিলেন—বড্ড দরকার। একবার বলো গিয়ে।

—কি দরকার ? এখন কোনো দরকার হবে না। ওবেলা এসো।

—আচ্ছা, গদাধরবাবুর কোনো সন্ধান দিতে পারো ? আমি তাঁর দেশের লোক, যশোর জেলার কাঁইপুর গ্রামে বাড়ী, থানা রামনগর…

চাকর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দাঁড়াও, আমি আসচি!

দুরু-দুরু বক্ষে ভড়মশায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি না-জানি বলে ! চাকরটা নিশ্চয় মনিবকে চেনে, অন্ততঃ নামও শুনিয়াছে।

এবার আবার দরজা খুলিল। চাকর মুখ বাড়াইয়া বলিল—আপনার নাম কি ? মাইজি বললেন, জেনে এসো।

—আমার নাম, মাখনলাল ভড়। আমি বাবুর সেরেস্তার মুহুরী। বলো গিয়ে, যাও।

কিছুক্ষণ পরে চাকর পুনরায় আসিয়া ভড়মশায়কে উপরে লইয়া গেল।

ভড়মশায় উপরে গিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এ সে মেয়েটি নয়—সেবার যাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন ! ইহার বয়স বেশি, গায়ের রং তত ফর্সা নয়।

মেয়েটি বলিল—আপনি কাকে চান ?

ভড়মশায় অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে কথা বলিতে অভ্যস্ত নন, কেমন একটা আড়ষ্টতা ও অস্বস্তি বোধ করেন এসব ক্ষেত্রে। বিনীত-ভাবে সসঙ্কোচে বলিলেন—আজ্ঞে, গদাধর বসু, নিবাস যশোর জেলায়।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—বুঝেচি, তা এখানে খোঁজ করচেন কেন ?

—এখানে আগে যিনি থাকতেন, তিনি এখন নেই ?

—কে ? শোভা মিত্তির ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই নাম।

—সে এখান থেকে উঠে গিয়েচে। তাকে কি দরকার ?

—তাঁর সঙ্গে আমাদের বাবুর জানাশোনা ছিল, একবার তাই এসেছিলাম।

—গদাধর বসু ? ন্যাশনাল সিনেমা কোম্পানীর জি, বসু তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনিই আমার বাবু। কিন্তু···

মেয়েটি বলিল—তা আপনি বলচেন গদাধরবাবুর মুহুরী দেশের—কিন্তু আপনি তাঁর কলকাতার ঠিকানা জানেন না কেন ?

ভড়মশায় পাকা লোক। ইহার কাছে ঘরের কথা বলিয়া মিছামিছি মনিবকে ছোট করিতে যাইবেন কেন ? সুতরাং বলিলেন—আজ্ঞে, তাঁর সেরেস্তায় চাকরি নেই আজ বছরাবধি। তাঁকে একটু বলতে এসেছিলাম, যদি চাকরিটা আবার হয়, গরীব মানুষ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বড় বিপদে পড়েচি, তাই।

—আপনি টালিগঞ্জে গিয়ে ষ্টুডিওতে দেখা করুন, ঠিকানা কাগজে লিখে দিচ্চি—বাড়ীতে এখন তাঁর দেখা পাবেন না !

ভড়মশায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, আনন্দে হাতে-পায়ে যেন বল পাইলেন। বাঁচা গেল, মনিবের তাহা হইলে জেল হয় নাই ! সেই ছবি-তোলার কাজেই লাগিয়া আছেন, বোধহয় চাকুরী লইয়া থাকিবেন।

মেয়েটি একটুকরা কাগজে ঠিকানা লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—ট্রাম থেকে নেমেই বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা গেলেই পাবেন। দেখবেন, লেখা আছে ন্যাশনাল ফিল্ম্ কোম্পানীর নাম গেটের মাথায় আর দেয়ালের গায়ে।

রাস্তায় পড়িয়া পথ হাঁটিতে-হাঁটিতে কিন্তু ভড়মশায়ের মনে আনন্দের ভাবটা আর রহিল না। মনিব জেলে যান নাই—আবার সেই ছবি-তোলার কাজই করিতেছেন, অথচ এই এক বৎসরের মধ্যে একবার স্ত্রীপুত্রের খোঁজ-খবর করেন নাই, এ কেমন কথা? এস্থলে আনন্দ করিবার মত কিছু নাই, বরং ইহার মূলে কি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া যাওয়াটা দরকার। ভড়মশায়ের মন বেশ দমিয়া গেল!

দমিয়া গেলেও, সেই মন লইয়াই অগত্যা পথ চলিতে-চলিতে একসময় তিনি ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। ট্রাম যথাসময়ে টালিগঞ্জ-ডিপোয় আসিয়া পৌছিল। অন্যান্য সহযাত্রীরা একে-একে নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া ভড়মশায়ের হুঁস হইল, তাঁহাকেও এবার নামিতে হইবে। ভড়মশায় ট্রাম হইতে রাস্তায় নামিয়া আবার হাঁটিতে সুরু করিলেন।

মেয়েটির নির্দ্দেশমত বাঁ-দিকের পথ ধরিয়া হাঁটিবার সময় দেখিলেন, ভিন্ন-ভিন্ন ছোট-ছোট দল যে সব কথাবার্ত্তা কহিতে-কহিতে চলিয়াছে ঐ পথে, তাহাদের মৃদুগুঞ্জনে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাহারা সকলেই এখন ভড়মশায়ের লক্ষ্য-পথের পথিক। যে কোনো কাজের জন্যই যাক্ না কেন, তাহারাও চলিয়াছে ঐ ষ্টুডিওর উদ্দেশে।

কিছু পথ যাইতেই চোখে পড়িল, সামনে অনেকখানি জায়গা করোগেট টিন দিয়া ঘেরা মস্ত বাগান, আর সেই বাগানের কাছে পৌছিয়াই তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাঁহার ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া গিয়াছেন। ঐ বাগানের ফটক। ফটকের দুইদিকে থামের মাথায় অর্দ্ধবৃত্তাকারে লোহার ফ্রেমে সোনালী-অক্ষরে জ্বলজ্বল করিতেছে—'ন্যাশনাল ফিল্ম্ ষ্টুডিও'।

মা-কালীকে স্মরণ করিয়া গেটের মধ্যে সবে পা দিয়াছেন, এমন সময় পিছন হইতে কোমরে আঁকশি দিয়া কে যেন টানিয়া ধরিল! ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, ইয়া গালপাট্টাওয়ালা পশ্চিমা-পহলবানের মত এক দীর্ঘবপু দরওয়ানজী হাঁকিয়া বলিতেছে,—কাঁহা যাতা ?

ভড়মশায় বলিলেন—যাঁহা আমার বাবু আছেন।

দরওয়ানজী হাঁকিল—গেট-পাশ হ্যায় ?

—হাঁ হ্যায়। আমার বাবুর কাছ থেকে এখুনি নিয়ে আসতা হ্যায়, এনে তোমায় দিয়ে দেবো।

—পহেলা ল্যাও, লে-আয়কে অন্দরমে ঘুঁসো।

—বেশ, এখুনি এনে দিচ্ছি, তোমারা কোনো চিন্তা নেই হ্যায়।

কথাটা বলিয়া ভড়মশায় অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই আবার পশ্চাৎ দিক হইতে শব্দের আকর্ষণ···কেঁউ, বাত মানেগা নেহি ? মত যাও···লৌটকে আও···

অগত্যা ভড়মশায়কে ফিরিতে হইল। এই বয়সে শেষে কি এক-জন খোট্টার কাছে অপমানিত হইবেন ?

ওই দেখা যায় একটা সুপারি গাছ···তার পাশেই মস্ত বড় পুকুর! পুকুরের ওপারে টিনের ছাদ-আঁটা মস্ত একটা গুদামের মতো। সেখানে কত লোক চলিতেছে-ফিরিতেছে···সকলেই যেন খুব ব্যস্ত! ভড়মশায় ভিতরে ঢুকিতে না পাইয়া নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, ঐখানেই ছবি তোলার কাজ হইতেছে। তারপর দ্বারবানের নিকটে আসিয়া সে কি আকুতি! দ্বারবান ভিতরে যাইতে দিবে না; ভড়মশায়কেও যাইতেই হইবে। মিনতি যখন

কলহে পরিণত হইবার উপক্রম, এমন সময় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভড়মশায়কে দেখিয়া লোকটি বলিলেন—কাকে চান ? ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

—আজ্ঞে, আমি গদাধর বসুমহাশয়কে খুঁজচি—নিবাস কাঁইপুর, জেলা···

—বুঝেচি ! আপনি ওখানে যাবেন না। ওখানে সেট্ সাজানো হচ্চে—ওখানে যেতে দেবে না আপনাকে। মিঃ বোসের আসবার সময় হয়েচে—এখানে আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন, মোটর এসে এখানে থামবে।

—আজ্ঞে, আপনার নাম ?

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলিলেন—কোনো দরকার আছে ? শান্তশীল রায়কে খুঁজে নেবেন এর পরে—আমার সময় নেই, যাই, আমাকে এখুনি সেটে যেতে হবে।

ভড়মশায় সেখানে বোধহয় পাঁচ মিনিটও দাঁড়ান নাই, এমন সময় —একখানা মাঝারি-গোছের লালরঙের মোটর আসিয়া তাঁহার সামনে লাল কাঁকরের রাস্তার উপর দাঁড়াইল।

ভড়মশায় তাড়াতড়ি আগাইয়া গেলেন, কিন্তু দেখিলেন, মোটর হইতে নামিল দুটি মেয়ে, হাতে তাহাদের ছোট ছোট ব্যাগ—তাহারা নামিয়াই দ্রুতপদে পুকুরের পারে চলিয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে আর-একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। এবার ভড়মশায়ের বিস্মিত ও বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে নামিলেন, গদাধর ও তাঁহার সঙ্গে একটি সুবেশা মহিলা। ভড়মশায় চিনিলেন, মেয়েটি সেই শোভারাণী মিত্র। ড্রাইভারের পাশের আসন হইতে

তক্‌মা-পরা এক ভৃত্য নামিয়া তাঁহাদের জন্য গাড়ীর দোর খুলিয়া সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়াইয়াছিল—সে এবার একটা ব্যাগ হাতে তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

ভড়মশায় আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—বাবু, বাবু

কিন্তু পিছনের ভৃত্যটি একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র, গদাধর ও মহিলাটি ততক্ষণে দ্রুতপদে পুকুরের পারের রাস্তা ধরিয়াছেন, বোধহয় ভড়মশায়ের ডাক তাঁহাদের কাণে পৌঁছিল না।

ভড়মশায় কি করিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় পূর্ব্বের সেই তরুণবয়স্ক ভদ্রলোকটিকে এদিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন।

ভড়মশায়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কাছে আসিয়া বলিলেন—কি, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে, দেখা হয়নি? এই তো গেলেন উনি।

ভড়মশায় নিরীহমুখে বলিলেন—আজ্ঞে, দেখা হয়েচে। ওই মেয়েটি কে বাবু?

ভদ্রলোক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ভড়মশায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—চেনেন না ওঁকে? উনিই শোভারাণী—মস্ত-বড় ফিল্‌ম্‌ষ্টার—ওই! মিঃ বোসের কপাল খুব ভালো। দু'খানা ছবি মার খেয়ে যাবার পরে—আশ্চর্য্য মশাই, শোভারাণী নিজে এসে যোগ দিয়েচে—চমৎকার ছবি হচ্চে—ডিষ্ট্রিবিউটারেরা খরচের সব টাকা দিয়েচে। শোভারাণীর নামের গুণ মশাই···মিঃ বোস এবার বেশ-কিছু হাতে করেছেন, শোভারাণীর সঙ্গে—ইয়ে—খুব মাখামাখি কিনা? একসঙ্গেই আছেন দু'জনে। আপনি কাজ খুঁজছেন বোধ হয়? তা, ধরুন না গিয়ে ম্যানেজারকে—আমি মশাই, বড় ব্যস্ত। গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি একটা জিনিস আনতে, শোভারাণীর বাড়ীতেই···ভুলে ফেলে এসেছেন··· নমস্কার!

ভড়মশায় হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—শেষ—